

Creative Journal

Volume-04, Issue-1
Year of Publication: August 2026
Plot 6, Avenue 6, Sector 17/H-1
Uttara Residential Model Town,
Dhaka 1230.
Email: editor_journal@smuct.ac.bd



বিদ্যালয় হোসেন
প্রভাষক
বাংলা বিভাগ
শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব
ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি
উত্তরা, ঢাকা ১২৩০

মোবাইল: ০১৩১৭৫৪৭৭৩৫/০১৫৮১৭৪৮৩৬৯
ইমেইল: mdbillalhossen383@gmail.com

রফিক আজাদের কবিতায় নিসর্গ-প্রকৃতি: নান্দনিকতা ও দায়বদ্ধতা

বিদ্যালয় হোসেন

সারসংক্ষেপ

রফিক আজাদের কবিতায় নিসর্গ-প্রকৃতির বহুস্তর প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। একদিকে কাব্যিক প্রকল্প হিসেবে প্রকৃতি কবির নান্দনিকবোধের বহিঃপ্রকাশ, অন্যদিকে কাব্যচর্চার বিশেষ পর্যায়ে বৈশ্বিক জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় কবির উচ্চকণ্ঠ গ্রহীয় অস্তিত্বের প্রতি দায়বদ্ধতার স্মারক। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রকৃতি যেভাবে কবির বোধের বাহন না হয়ে যথাসম্ভব তার স্বরূপে উপস্থাপিত হত, রফিক আজাদের প্রকৃতি তেমনটি নয়; বরং প্রকৃতির ভেতর তিনি নিজেই আঁটেপুটে জড়িয়ে পড়েন। কাব্যসাধনার দীর্ঘ পরিক্রমায় সমকালীন আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন ও সাংস্কৃতিক অভিঘাতের ফলে কবিচৈতন্যের যে রূপ-রূপান্তর, প্রকৃতির সাহচর্যে ঘটে তার কাব্যিক প্রকাশ। ফলে প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের কাব্যে প্রকৃতি এবং স্বাধীনতা-উত্তর পর্বের কাব্যে প্রকৃতি সমান্তরাল অনুধ্যানে বিধৃত নয়। আলোচ্য প্রবন্ধে রফিক আজাদের প্রকৃতি-ভাবনা রাষ্ট্রের বিচিত্র অভিঘাতে কী ধরনের নান্দনিক মাত্রা পরিগ্রহ করেছে সেই দিকে আলোকপাত করার পাশাপাশি বৈশ্বিক জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় তাঁর প্রকৃতি-ভাবনার স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে গুণগত (Qualitative) ও পাঠ-কেন্দ্রিক বিশ্লেষণ (Textual Analysis) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। রফিক আজাদের কবিতার ভেতরকার শব্দচয়ন, রূপক, প্রতীক, চিত্রকল্প প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে কবির নান্দনিক বোধের পরিচয় উন্মোচনের পাশাপাশি দেখানো হয়েছে নিসর্গ-প্রকৃতির প্রতি কবির গভীর দায়বদ্ধতা। তাত্ত্বিক কাঠামো (Theoretical Framework) হিসেবে ইকোট্রিসিজমের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

মূলশব্দ : নিসর্গ-প্রকৃতি, ইকোট্রিসিজম, নৈরাশ্যাক্রান্ত, শৈল্পিক উপকরণ, ক্ষমতা-কাঠামো, জলবায়ু সংকট।

কাব্যের অন্যতম প্রধান অবলম্বন নিসর্গ-প্রকৃতি। কবি-চৈতন্যের বিচিত্র অনুভবকে বহিরাঙ্গিক নানা অনুঘপে ব্যঞ্জনাময় করে তোলা যেকোনো মহৎ কাব্যের মৌল প্রবণতা। আর এক্ষেত্রে বহুল-চর্চিত ও পরীক্ষিত মাধ্যম নিসর্গ-প্রকৃতির অপার সম্ভার। নিসর্গ-অনুধ্যানে কবি একদিকে জগজ্জীবন সম্পর্কিত বিমূর্ত দর্শনকে মূর্ত করে তুলেন, অন্যদিকে শিল্পাবেগের উৎকর্ষে ঘটে নান্দনিকবোধের সম্প্রকাশ। নিসর্গ-প্রকৃতি কখনো স্বরূপে, কখনো কবির অন্তঃসংশ্লেষী ভাবের অবলম্বনরূপে কাব্যের নান্দনিক প্রতিশ্রুতিকে পূর্ণতা দেয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় প্রকৃতির প্রাণময় সজীবতার প্রতি কবির অন্তহীন আকৃতি। মানবসৃষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞান-মূল্যবোধের অনড়-যান্ত্রিকতার প্রতিকল্প হিসেবে কবির প্রার্থিত আশ্রয় হয়ে ওঠে প্রকৃতির সহজ, অকৃত্রিম সান্নিধ্য। কাব্যকৃতিতে নিসর্গ-প্রকৃতির ব্যবহার সম্পর্কে নন্দদুলাল বণিকের বক্তব্যটি প্রতিধানযোগ্য:

নিসর্গে মানবত্ব আরোপ, নিসর্গপ্রকৃতির প্রতি ব্যবহারিক দৃষ্টি, অনুভূতিময় প্রকৃতি-বর্ণনা, নিসর্গপ্রকৃতির প্রতি আত্মলীন দৃষ্টি- এই রকম বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে নিসর্গপ্রকৃতিকে দেখা ও বর্ণনা করা যেতে পারে। (নন্দদুলাল ১৯৯৯: ১৬৩)

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ থেকে আধুনিককাল অবধি কাব্যসাধনার সামগ্রিক পরিমণ্ডলে নিসর্গ-প্রকৃতির বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি নিসর্গ-প্রকৃতির বিপুল ব্যবহারের নেপথ্যে রয়েছে এদেশের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বিশেষত পূর্ববাংলা অর্থাৎ বাংলাদেশে নিসর্গের বহুমাত্রিক বিন্যাসের অপরূপ সৌন্দর্য এবং প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের সুনিবিড় সংযোগ কবিদের কাব্য-কৃতিকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। এক্ষেত্রে হুমায়ুন কবিরের বক্তব্যটি স্মরণযোগ্য:

বাঙলা চিরদিনই কবিতার দেশ। একমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বৈচিত্র্যই বাঙালিকে কবি করেনি- তার কবিপ্রতিভার মূলে মননরীতির বৈশিষ্ট্যও সমানই পরিস্ফুট। বাঙলার আকাশে নিদাঘ রৌদ্রের নিষ্ঠুর দীপ্তি, আষাঢ়ের ঘন বর্ষার মেঘসম্ভারের মধ্যে ঐশ্বর্য ও মহিমা, এবং শ্রাবণের দিবাৱাত্রি অবিরাম বর্ষণধারার সঙ্গীতে হৃদয়াবেগের প্রতিচ্ছবি। ষড়ঋতুর বিচিত্র নৃত্যলীলা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন যে বাঙালির কবিমানসের উৎস- কোথায়।... ছয়টি ঋতুর এ বিচিত্র খেলা। প্রকৃতির চঞ্চল পরিবর্তনশীল সৌন্দর্যের সে ঐশ্বর্য-যে বাঙালির মনকে কাব্যজগতে আকর্ষণ করেছে, তাতে বিচিত্র কী? (হুমায়ুন ২০১৮: ১৫)

নিসর্গ-প্রকৃতির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য যেমন কবিচিন্তকে ভাবুক করে তুলেছে, তেমনি উপনিষদের প্রকৃতি-সংলগ্ন জীবন-দর্শন কবিমনকে করেছে প্রভাবিত।

উপনিষদীয় দর্শন পৃথিবীর সবকিছুকে আত্মীয়তার সম্বন্ধে আবদ্ধ করতে চায়। ফলে প্রকৃতি মানব-সম্পর্ক বহির্ভূত কোন পৃথক বস্তু নয়। প্রাচীন ভারতের আদিম দর্শন সাংখ্য মতে প্রকৃতি আদ্যাশক্তিরূপে চিহ্নিত। সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি-প্রাধান্য বাংলায় প্রাকৃত-মনের দর্শনচিন্তা ও সংস্কৃতি-সাধনাকে প্রভাবিত করেছে। পরবর্তীকালে কাঠামোবাদী ধর্ম আধিপত্য বিস্তার করলেও প্রাকৃতজনের প্রকৃতিলগ্ন জীবন-দর্শনকে অগ্রাহ্য করতে পারেনি। একজন কবি যেহেতু তাঁর পরিচিত পরিমণ্ডলকে অস্বীকার করতে পারেন না, সেহেতু তাঁর কাব্য-প্রদেশে স্থানীয় ভূগোল ও সংস্কৃতির প্রভাব অনিবার্যভাবেই স্বীকৃত হয়।

রফিক আজাদ বাংলাদেশের প্রধান কবি না হলেও গুরুত্বপূর্ণ কবি। তাঁর কবিতা নিয়ে এ পর্যন্ত এককভাবে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন আহমেদ মাওলা। রফিক আজাদের কাব্যের বিষয়-প্রকরণ উভয় বিষয়ে আলোচনা

হলেও রফিক আজাদের কবি-মানসের রূপান্তরের ধারাবাহিকতা এবং তার সমান্তরালে প্রকৃতিচেতনার সামগ্রিক উপস্থাপনা সীমিত। রফিক আজাদকে নিয়ে এককভাবে কাজ না করলেও তাঁকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন অধ্যাপক ড. বায়তুল্লাহ কাদেরী। তিনি বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ শিরোনামে পিএইচডি অভিসন্দর্ভ রচনা করেন। তাঁর এ গবেষণা-গ্রন্থে ষাটের দশকের কাব্যপ্রবণতা, বিষয় ও শিল্পরূপ উভয় দিক থেকে সমৃদ্ধ আলোচনা থাকলেও ষাটোত্তর পর্বের প্রকৃতির ইতিবাচক উপস্থাপনা নেই। এককভাবে গ্রন্থ রচনা না করলেও রফিক আজাদকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন অধ্যাপক রফিকউল্লাহ খান তাঁর *বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর গ্রন্থে*। এছাড়াও তাঁকে নিয়ে আরো বেশ কয়েকজন লেখকের প্রবন্ধ রয়েছে। এ পর্যন্ত রফিক আজাদকে নিয়ে কয়েকটি সাহিত্য-পত্রিকা রফিক আজাদ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। তার মধ্যে মিন্টু হক সম্পাদিত কাশবন পত্রিকা এবং আশরাফ জুয়েল এবং অমিত গোস্বামীর যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে পূর্ব-পশ্চিম পত্রিকা। এই প্রবন্ধে চেষ্টা করা হয়েছে ইতিহাস- রাজনীতি রূপান্তরের বাঁকে-বাঁকে রফিক আজাদের কবি-মানসের যে রূপান্তর তা অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে তাঁর নিসর্গ-প্রকৃতি চেতনার সামগ্রিক রূপ উপস্থাপনের।

রফিক আজাদের কাব্যে নিসর্গ-প্রকৃতি চেতনা যথাযথভাবে অনুধাবনের জন্য কবি হিসেবে তাঁর আগমনের কাল ও কবিস্বভাবের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন। আন্দোলন-সংগ্রামে মুখরিত ষাটের দশকে কাব্যমঞ্চ কাঁপিয়ে রফিক আজাদসহ একদল কবির আগমন ঘটে, যারা বয়সে তরুণ অথচ জরাগ্রস্ত, সংক্ষুব্ধ অথচ আত্মবিবরবাসী, ভোগী অথচ অপ্রাপ্তির দহনে পীড়িত। পাপ ও পঙ্কিলতায় পরিকীর্ণ এই কবিরা অগ্রজে অবিশ্বাস, প্রচলিত মূল্যবোধে অনীহা এবং আত্মপীড়নে জর্জরিত হয়ে কবিতাকে করে তোলেন সমাজ ও সমকাল-বিমুখ। আইয়ুবী দমন-পীড়নের প্রতিক্রিয়ায় কিশোর থেকে বৃদ্ধ, ছাত্র থেকে শিক্ষক, হতদরিদ্র থেকে উচ্চবিত্ত, গ্রামবাসী থেকে শহরবাসী একযোগে বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়। শোষণ যেখানে তীব্র, প্রতিরোধ সেখানে ইস্পাতদৃঢ় এই সত্য ষাটের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রবলরূপে প্রতীয়মান হলেও তরুণ কবিরা শিল্পের গহবরে পলায়নপরতার নীতিই গ্রহণ করেছিলেন। তবে তাদের এই নেতিবাদী জীবন-দৃষ্টির অন্তর্মূলে আইয়ুবী শোষণের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। স্থবির রাজনীতির দমন-পীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে কবির মানস বিকাশের সুযোগ যেখানে তিরোহিত, সম্ভাবনার দ্বারে দ্বারে ঝুলে আছে নিষেধের তালা, সেখানে আত্মবিবরবাস ছাড়া কবির গতান্তর নেই। এ সময়ের কবিরা বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে পরিবর্তিত নানা দর্শন, শিল্পান্দোলন, নবনব প্রকরণ-প্রকৌশল তাঁদের কবিতায় অঙ্গীকৃত করে দেন। ষাটের অধিকাংশ কবির চেতনায় নারী লিবিডোর অন্তর্চাপ-মথিত যৌনসর্বস্বতার প্রতিরূপ, পুরুষতান্ত্রিক ভোগী-মানসিকতার আনন্দ-উপকরণ মাত্র। বোদলেয়ারী ভাবধারা-পরিম্নাত নগরজীবনের ক্রন্দ, জরা, ক্ষয়, ষাটের কবিদের এতটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে গ্রামীণ নিসর্গের প্রতি আত্মহাসিত হওয়ার অবকাশ অধিকাংশ কবি পাননি। ষাটের দশকের কবিতার এই মৌল প্রবণতার সত্ত্বেও একই দশকে দুটি পর্ব পরিলক্ষিত হয়। প্রথম পর্বের প্রতিনিধি-স্থানীয় কবি শহীদ কাদরী (১৯৪২-২০১৬) এবং রফিক আজাদ (১৯৪১-২০১৬)। দ্বিতীয় পর্বের কবিদের মধ্যে আছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০), আসাদ চৌধুরী (১৯৪৩-২০২৩) মোহাম্মদ রফিক (১৯৪৩-২০২৩), নির্মলেন্দু গুণ (১৯৪৫- বর্তমান), মহাদেব সাহা (১৯৪৪-বর্তমান), আবুল হাসান (১৯৪৭-১৯৭৫), হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪) প্রমুখ।

ষাটের দশকের প্রথম পর্বের প্রধান কবি শহীদ কাদরী (১৯৪২-২০১৬)। আবাল্য নগর-প্রতিবেশে বেড়ে-ওঠা এই কবি কাব্যের বিষয় ও প্রকরণ-বৈদগ্ধ্য পুরোদস্তুর নাগরিকতাকে আশ্রয় করেছেন। তবে

তিনি যে নাগরিক ঢাকার রূপায়ন নির্মাণ করেছেন ষাটের দশকের অবিকশিত নগর-ঢাকার সঙ্গে তা সাজু্যপূর্ণ নয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যে তিনি যে নগর ও নাগরিক বৈকল্যকে অবলোকন করেছেন নিজের নগরকে তারই সমীপবর্তী করে তুলেছেন। কালিদাসের কাল থেকে বিদ্যাপতি-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল পর্যন্ত বৃষ্টি-বন্দনার যে রোমান্টিক মাধুর্য, শহীদ কাদরীর কাব্যে প্রত্যক্ষ করা যায় ঠিক ভিন্ন চিত্র। এ বৃষ্টি নাগরিক ক্লেশ, বিবমিষা ও সন্ত্রাসের বাহক:

রাজত্ব শুধু আজ রাতে, রাজ-পথে-পথে
বাউড়ুলে আর লক্ষ্মীছাড়াদের, উন্মুল,
উদাস্ত বালকের, আজীবন ভিক্ষুকের, চোর আর অর্ধ-উন্মাদের
বৃষ্টিতে রাজত্ব আজ।
(শহীদ ২০১০: ১১)

শহীদ কাদরীর কাব্যে যে নৈঃসঙ্গ্যানুভূতি, স্বদেশে পরবাসীর বোধ, বৈকল্য ও অবক্ষয়চেতনা, তার কেন্দ্রে রয়েছে সমকালীন আইয়ুবী শাসনের সঙ্গে অভিযোজিত হতে না পারার যন্ত্রণা। জন্মেই কবি যে স্বদেশ প্রত্যক্ষ করেন সুন্দর ও স্বতঃস্ফূর্ত অভিযোজনের সুযোগ সেখানে নেই। শহীদ কাদরী নাগরিক নারীর, বিশেষত শহরের গণিকাদের খন্দের হয়ে দাঁড়িয়ে যান লাইনে, বোহেমিয়ান জীবনে গণিকার শুকনো স্তনেই ছাঁড়েন পরিতৃপ্তি টেকুর। বস্তৃত অবক্ষয়িত কালের স্মারক হিসেবেই এ বিকৃত যৌনাচার। তাঁর চেতনায় নগর এতটাই পরিব্যস্ত হয়ে আছে যে গ্রামের নিসর্গের প্রতি সামান্যতম অনুভব তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত। তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা কাব্যগ্রন্থ থেকে নিঃসঙ্গ আত্মবিবরবাসী কবি শহীদ কাদরী সমাজসংলগ্ন ও স্বদেশিকতাবোধে উদ্দীপ্ত হয়েছেন।

ষাটের দশকের প্রথম পর্বের প্রধান কবি শহীদ কাদরীর অনুসৃত কাব্যস্রোত অনুসরণ করেছেন কবি রফিক আজাদ (১৯৪১-২০১৬)। আবাল্য নগরবাসী নন কিন্তু নগরপ্রেমী এই কবি নাগরিক ক্লেশ, অবক্ষয়, বিবমিষা ও বৈকল্যকে কবিতার অন্তর্প্রদেশে স্থাপন করে হয়ে উঠেছেন বোধলৈয়ারীয় নেতিবাদী চেতনার ধারক। সমকালীন স্বদেশকে কবি আত্মস্থ করেছেন নিজস্ব ভঙ্গিমায়, নেতি ও ক্লেশে উদ্দীর্ণ করেছেন অপ্রাপ্তির জ্বালা।

ষাটের কাব্য-আন্দোলনের প্রধান বাহন ছিল লিটল ম্যাগাজিন। সেজন্য এ যুগকে বলা হয় লিটল ম্যাগাজিনের যুগ। একজন সৃষ্টিশীল কবি সমাজে বিদ্যমান ভাষাকে পরিস্ফুট করে বিষয় কিংবা প্রকরণে নতুনত্ব হাজির করেন। কেননা তাঁর দৃষ্টি সাধারণের চেয়ে অগ্রবর্তী। সৃষ্টিশীল কবির এই নতুনত্বকে ধারণ করবার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের থাকে না। ফলে কবিকে প্রতিষ্ঠিত পথের পরিবর্তে নতুন পথ নির্মাণ করে নিতে হয়। মোহাম্মদ আজম লিখেছেন:

দ্বিতীয় বা তৃতীয় ধারার সৃষ্টিশীলতা সময়ের প্রচণ্ডতাকে ধারণ করে উৎপাদিত হলেও নতুনত্বের কারণে তার ভোক্তাসমাজ তৈরি থাকে না। প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানগুলো তাকে জায়গা দিতে পারে না; কারণ একদিকে তার অনুমোদিত সীমায় সেগুলো আঁটে না, অন্যদিকে তার ভোক্তাসমাজ অপরিচয় হেতু নতুন পণ্য ক্রয়ে অস্বীকৃতি জানায়। কাজেই প্রতিষ্ঠানগুলো সচেতনভাবে নতুন সাহিত্যিকর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে না- ব্যাপারটা মোটেই এমন নয়; বরং নতুন সাহিত্য তার নতুনত্বের পুরস্কার ও পরোক্ষ স্বীকৃতি-স্বরূপ প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায় না। এ কারণেই দরকার হয় নতুন প্রতিষ্ঠান লিটল ম্যাগ। (মোহাম্মদ ২০২৩: ১২৬)

রফিক আজাদ নিজেও আবদুল মান্নান সৈয়দের সহযোগে ‘স্বাক্ষর’ নামক ক্ষণজীবী কিন্তু প্রভাবশালী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ষাটের দশকের প্রথম পর্বের কবিরা নিজেদের স্যাড জেনারেশন হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। সমাজের যে বিনষ্টিকে তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, স্যাড জেনারেশনের ইশতেহারে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। যদিও স্যাড জেনারেশনের প্রধান কারিগর রফিক আজাদের কাব্যগ্রন্থের ভাঁজে ভাঁজে ইশতেহারে উদ্ধৃত বক্তব্যের বিপরীত বয়ানও লুকায়িত আছে। ইশতেহারে তাঁদের ঘোষণা হলো:

We don't know what we are doing. We are really undone, really helpless. We are poisoning us consciously, Yes we are helpless. We are guilty. We are bearing Dynamites in our blood. We know it. But we are helpless. Simply undone. We have no other alternative except SELF-DESTRUCTION.

Death is our darling, but not those bloodz ladies who are loitering before our eyes.

We have no friends. We are not friendly with others. We have a faithful friend CIGARETTE.

We have conventional live-we cannot tolerate the conventional nations of private and public morality.

Life is meaningless. We are living meaninglessly. We are constantly living in anxieties. We know the intensity of our anxieties to feel and know that we EXIST and that is the root of all our anxieties.

We are every MOMENT swimming in the ocean on MENTAL and PHYSICAL agitations for which happiness is foreign to us.

I should warn the headless conventional gentleman and the bloodz critics in this connection that we are not sex-driven youth. We are faithful to ourselves and to our. SADNESS there should be no Doubt in it.

We are not beatniks or angries, remember we are ‘Bipanna.’ And that is why we are ‘SAD’.

We are not beatniks or angries, remember we are ‘Bipanna’. And that is why we are ‘Sad’.

We are for no time, interested in politics and newspapers. When, that do we want? NOTHING, NOTHING-We want nothing from our bloodz society.

We are exhausted, annoyed, tired and ‘Sad’ (Sad Generation Vol. 1. 1964)

ষাটের দশকের কবিদের সম্পর্কে প্রধান অভিযোগ হলো তাঁরা সমাজ ও রাজনীতি-বিমুখ। সামাজিক দায়বদ্ধতাকে এড়িয়ে “শৈল্পিক ফ্যাশন” হিসেবে তারা উচ্ছৃঙ্খলতার ভেতর আমোদ অনুসন্ধান করেছেন। তবে কোনো কোনো সমালোচক ষাটের কবিদের সমাজ-বিশিষ্টতার জন্য সামরিক শাসনের একনায়কতান্ত্রিক নিষ্পেষণকেই দায়ী করেছেন। এমনকি রফিক আজাদও ষাটের নৈরাশ্য-প্রবণতাকে শৈল্পিক দ্রোহ হিসেবে গণ্য করেছেন:

ঐ সময় সামরিক শাসন চলছিল। এর মাধ্যমে মূলত এক ধরনের বিদ্রোহ করা। আর রাজনৈতিক সচেতনতা থেকেই এ পঙ্ক্তি লেখা। কবি বলেন, সামরিক শাসন আমাদের বুকের উপর জগদল পাথরের মতো চেপে বসে। এর মাধ্যমে আসলে সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিদ্রোহ করি। যার লক্ষ্য ছিল সামরিক শাসনকে প্রতিরোধ করা বা উড়িয়ে দেয়া। কিন্তু পদ্ধতিটা তুমি বলতে পারো ‘Self Destructive’। (রফিক ২০১৯: ১৪৭)

প্রকৃত প্রস্তাবে সামরিক শাসনের সার্বক্ষণিক নজরদারি ভেঙ্গে এই তরুণ কবিকুল স্পষ্টসুরে রাজনৈতিক বক্তব্য উচ্চারণ করতে ব্যর্থ হলেও ব্যর্থতাজনিত ক্ষোভ থেকে আত্মপীড়ণে নিমগ্ন থেকেছেন। সময়ের জগদল ভারকে বিস্মৃত হতে আশ্রয় নিয়েছেন শিল্পের বারান্দায়। রাজনীতি থেকে পলায়নপরতার রাজনীতি হিসেবেই ষাটের কবিতা তাৎপর্যপূর্ণ।

ষাটের দশকের অন্যতম প্রধান কবি রফিক আজাদ এ সময়ের কাব্যপ্রবণতাকে কেবল নিজের কবিস্বভাবে ধারণাই করেননি, রীতিমতো স্যাড জেনারেশনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তবে ষাটের দশকে তিনি আবদ্ধ থাকেননি। যে কোনো সৃষ্টিশীল মানুষের জন্য সুনির্দিষ্ট ছকের পুনরাবৃত্তি মৃত্যুর সমতুল্য। শিল্পীসত্তা বেঁচে থাকার তাগিদেই তাঁকে নিজস্ব বলয় অতিক্রম করে যেতে হয়। দেবেশ রায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে লিখেছেন:

লেখকের কোনো রচনাই তাঁর পূর্ববর্তী রচনার পুনরাবৃত্তি নয়, পাঠকও সে-পুনরাবৃত্তি পড়তে চান না। কিন্তু প্রত্যেকটি রচনার মৌলিকতার মধ্যেও পাঠক একটা যোগসূত্র রচনা করে-করে যেতে পারবেন-এমন প্রত্যাশাই পাঠকের থাকে। (দেবেশ ২০১০: ৮৬)

রফিক আজাদ আমৃত্যু শুধুই কবি। তবে তিনিও নির্দিষ্ট বলয়ে আবদ্ধ থাকেননি, বরং ক্রমাগত তাঁর কবিসত্তার রূপান্তর সাধিত হয়েছে। তাঁর সেই রূপান্তরের ভেতর রক্ষিত হয়েছে সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতা। প্রথম পর্বের নেতি-নিমগ্ন ও নৈঃসঙ্গ্য-পিয়াসী রফিক আজাদ দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ থেকেই সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে সমর্পিত। নগরের রাত্রি-সাধক, দায়হীন কাম-চরিতার্থতায় পরিতৃপ্ত রফিক আজাদ ক্রমশ ফিরে এসেছেন সদর্থক জীবনবোধ এবং নৈসর্গিক সৌন্দর্যের সমুজ্জ্বল প্রান্তরে।

রফিক আজাদের সামগ্রিক কাব্যসাধনার পরিমণ্ডলে নিসর্গ-প্রকৃতি এক অনন্য দ্যোতনায় সমাগত হয়েছে, যা তাঁর ব্যক্তিত্ব ও জীবনবোধের গভীরতর প্রকাশ। ষাটের দশকের অস্থির সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে-ওঠা রফিক আজাদের কবি-মানস দেশ-কালের সমান্তরালে ক্রম-রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে তাঁর নিসর্গ-প্রকৃতি সম্পর্কিত বোধ স্থির-বিন্দুতে সমর্পিত নয়। চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের সদর্থক কাব্য-প্রবণতাকে প্রত্যাখ্যান করে ষাটের দশকে আগমন ঘটে একঝাঁক তরুণ বোহেমিয়ান কবির। আন্দোলন-সংগ্রামে মুখরিত ষাটের দশকের রাজনৈতিক সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে তরুণ কবিকুল হয়ে ওঠেন পলায়নপর, আত্মবিবরবাসী। রফিক ষাটের কাব্য-আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ অসম্ভবের পায়ে ষাটের দশকের কাব্য প্রবণতাকে সর্বতোভাবে আত্মীকৃত করে রচিত। স্বদেশ-সমকাল থেকে বিস্ত্রিষ্ট এই কাব্যগ্রন্থে বিধৃত নৈসর্গিক অনুষ্ঙ্গ কোন সদর্থক জীবনবোধের পরিচয়বাহী নয়। কোন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় রফিক আজাদ স্বদেশবিস্ত্রিষ্ট এবং পুঁজি-নিয়ন্ত্রিত অর্থ-ব্যবস্থায় কিভাবে নিসর্গ হয়ে উঠে চেতনা-সংহারী এ গবেষণায় তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

রফিক আজাদের সমগ্র জীবনে কবিতা-ভিন্ন সাহিত্যের আর কোনো শাখায় পদচারণা নেই। তাঁর

কাব্য-সাধনার সুদীর্ঘ পরিসরে নিসর্গ ভাবনার মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ১৯৭১ সালের দীর্ঘ নয়মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার মাধ্যমে কবি-মনে সঞ্চারিত হয়েছে প্রদীপ্ত আশাবাদ। সেই আশাবাদের পরিপ্রেক্ষিতেই রূপান্তরিত হয়েছে তার নিসর্গ সম্পর্কিত বোধ। রফিক আজাদের সামগ্রিক কাব্যসাধনা প্রধানত আবর্তিত হয়েছে তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে নারী-নিসর্গ-স্বদেশ। নারী ও নিসর্গের ভেতর যে কোমলপ্রাণ সজীবতা অনুভব করেছেন তার সমান্তরালেই বর্ধিত হয়েছে রফিক আজাদের স্বদেশিকতাবোধ। স্বদেশ সম্পর্কিত তাঁর ইউটোপীয় প্রকল্প ‘চুনিয়া’ নৈসর্গিক সৌন্দর্যের সমান্তরালেই নির্মিত। একই সঙ্গে নিসর্গের আদিম সারল্য ও প্রশান্তি-দায়িনী রূপ তিনি লক্ষ করেছেন নারীর মধ্যে। রফিক আজাদের নিসর্গ রোমান্টিকতা-আক্রান্ত এবং কবি চৈতন্যের সমান্তরালে উপস্থাপিত। তবে একটা বিশেষ পর্যায়ে তিনি হয়ে ওঠেন পরিবেশ সচেতন। পরিবেশবাদী সাহিত্য সমালোচনা দৃষ্টিকোণ থেকে তা বিচার করা হয়েছে। নব্বইয়ের দশকে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়, রফিক আজাদ নিজ দেশের পরিবেশ বিপর্যয়ে প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। এখানে প্রকৃতি কেবল সৌন্দর্যের আধার নয়, গ্রহীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রধান মাধ্যম। ফলে বৃক্ষরাজির প্রতি কবির যে প্রেম ও দায়বদ্ধতা, তা প্রয়োজন থেকে উৎসারিত। *বিরিশি পর্ব* কাব্যে রফিক আজাদের নিসর্গ-প্রকৃতির অনুভব সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। নগর ও পরিবার বিচ্ছিন্ন কবির একাকিত্ব বোধ প্রকট হয়ে উঠে এবং রক্ষ প্রকৃতির বাস্তব অভিজ্ঞতা পাঠককে রফিক আজাদের পূর্ববর্তী কাব্যের রোমান্টিক অনুভব থেকে ভিন্নতর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করে।

রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতা অপেক্ষাকৃত শান্ত-স্থির ভিক্টোরিয়ান আদর্শের সংস্পর্শে বিভূষিত। রোমান্টিক অনুভবে তিনি প্রকৃতির ‘জৈব-মূর্তি’কে প্রায় অস্বীকার করে স্বকীয় চেতনায় জারিত করেছেন। রফিক আজাদের কাব্যে নিসর্গ-প্রকৃতি রোমান্টিকতাকে স্পর্শ করলেও তিনি মোটেও রাবীন্দ্রিক অর্থে রোমান্টিক নন। দ্বিতীয় পর্বের কাব্যে কবির দৃষ্টি গ্রাম-অভিমুখী কিন্তু মোটেও নগরের বিকল্প হিসেবে গ্রামের প্রস্তাব তিনি করেন না। শুরু থেকে শেষাবধি তাঁর আরাধ্য নগর; কিন্তু বিশেষ অর্থে গ্রামের কিছু বৈশিষ্ট্য তিনি নাগরিক পরিসরে কামনা করেন। নগর থেকে গ্রাম ও গ্রামীণ নিসর্গের প্রতি তাঁর রোমান্টিক দৃষ্টিপাত স্পষ্ট; কিন্তু জীবনযাপনের জন্য গ্রামকে তিনি কোনোভাবেই বেছে নেন না। রফিক আজাদের সমগ্র কাব্য পরিসরে এই রোমান্টিক দৃষ্টি ও বাস্তবতাবোধের টানাপোড়েন পাশাপাশি বিরাজমান।

অসম্ভবের পায়ে

নগর বাতাবরণে আবর্তিত অসম্ভবের পায়ে কাব্যগ্রন্থে বোদলেয়ারীয় ক্লেদ, নৈরাশ্য, বিবমিষা ও নাস্তি-চেতনার প্রতিবিম্বায়নে রফিক আজাদ চেতনা-সংহারী নাগরিক নিসর্গের বহুস্তর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। ষাটের দশকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সামরিক অবরুদ্ধতায় দুঃসহ ভারে অবনত কবিচেতন্য নগর-পরিবৃত্ত জীবনের ক্ষত উন্মোচনের কাব্যিক উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে নগরের ভয়াল রাত্রি, রাত্রিকালীন শৈত্য, অশুচি নোংরা জল, বালুময় সমুদ্র সৈকত, রক্তাক্ত পাখির ঠোঁট প্রভৃতি অনুষঙ্গ। *অসম্ভবের পায়ে* কাব্যগ্রন্থে গ্রামীণ নিসর্গ-প্রকৃতির প্রাণময় সজীবতা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। জীবনের নঞর্থক চেতনার অনুরণনে নিসর্গও হয়ে উঠেছে নেতি-গন্ধী।

অসম্ভবের পায়ে কাব্যে রাত্রি-প্রধান নৈসর্গিক আবহের প্রাধান্য। রাত, রাতের অন্ধকার নৈরাশ্যাক্রান্ত কবির পরাভব সংকটকে প্রকট করে তোলে। আইয়ুবী কালো দশকের নিষ্পেষণে দিনের সমুজ্জ্বল আলো পরাহত হয় নাগরিক অন্ধগুলির ভয়াল মূর্তিতে। দিনের নির্মল সূর্যালোকের বিপরীতে নাগরিক অন্ধকারে দেখা মেলে কৃত্রিম আলো; কিন্তু সে আলোও দূষিত। জ্যোৎস্নাহীন কৃত্রিম নিয়ন আলোয় কবি বিভ্র-বৈভবে জৌলুসপূর্ণ নগরের অতলান্তিক ক্ষতকে উন্মোচন করে দেখান। এখানে নেই কোনো মঙ্গলবোধ, সুচেতনা:

কী ব্যাপার রফিক সাহেব? কাকে চাই, জ্যোৎস্নাকে তো?
জ্যোৎস্না আর নেই; সেদিন দুপুর রাতে
তাকে এই মহল্লার ক'জন বিখ্যাত বদমাশ
ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে নগরের বাইরের কোথাও
(রফিক ২০১৬: ৭৫)

গ্রাম থেকে কাক্ষিত জীবনের কামনায় শহরে-আসা রফিক আজাদের নগরের সঙ্গে একাত্ম হতে না পারার যন্ত্রণাবোধ প্রকট হয়ে উঠে। জ্যোৎস্না-স্নাত জীবনের সার্থকতা গ্রামীণ অকৃত্রিমতায় ফেলে এসে কবি পতিত হয়েছেন জ্যোৎস্নাহীন অন্ধকারে।

মধ্যবিভ কবির কাছে রাতের জীবনের জৌলুস পরম আকাক্ষিত হলেও তা থেকে যায় অধরা। ‘স্বগত মৃত্যুর পটভূমি’ কবিতায় প্রেমিকারূপী রাত্রির স্তোত্রে সমর্পিত কবি মধ্যরাতে আলোকিত রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছেন কিন্তু মুঘল স্থাপত্যের মতো কারুকার্যময় রাত্রির দ্বার মধ্যবিভ কবির জন্য উন্মোচিত হয়নি। অথচ লম্পট, জোচোররা অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে অনায়াসে ভোগ করে নাগরিক জৌলুস। ফলে রফিক আজাদের কাছে রাত্রিকালীন নাগরিক নিসর্গ পরিতৃপ্তির নয়; অপ্রাপ্তি, নৈরাশ্য ও নৈঃসঙ্গ্যানুভূতির অনুষ্ণেই ব্যবহৃত।

অসম্ভবের পায়ে কাব্যের একাধিক কবিতায় ভয়াল রাত্রির আবহ নির্মাণে শীতের প্রসঙ্গ এসেছে। শীতের রক্ষতায় বৃক্ষ তার সজীবতা হারিয়ে হয়ে উঠে নিঃশ্ব, সহায়হীন। সংবেদনশীল হৃদয়ের মধ্যবিভ কবি পুঁজি-অর্থব্যবস্থার কারণে অসদুপায়ে বিভ্র সঞ্চয়ে অক্ষম। নিজের নিঃশ্বতাকে শীত-রাত্রির আবহে তুলে ধরেছেন।

মধ্যরাতে, নাক্ষত্রিক নৈঃশব্দের মতো স্থায়ী, অকৃত্রিম, সেই এক আত্মীয় অনুভূতি, যা একেকবার
ক্রোধে, উল্লাসে আমাকে উলঙ্গ ক’রে জানুয়ারি-রাতে ছেড়ে দ্যায় নগরের ঠাণ্ডা, কনকনে রাস্তায়।
(রফিক ২০১৬: ৭৫)

ইউরোপের শীতপ্রধান দেশগুলোতে শীত জনজীবনে দুর্ভোগ বয়ে আনে। আধুনিক কবির শীতের অনুভূতিকে প্রায়শই অস্তিত্ব সংকটের সমান্তরালে উপস্থাপনা করেছেন। ষড়ঋতুর বাংলাদেশে স্বল্পকাল পরিব্যাপ্ত শীত উচ্চবিভ্র-মধ্যবিভ্রের বাস্তব জীবনে কোনো বিভীষিকার নাম নয়। রফিক আজাদসহ ষাটের দশকের অধিকাংশ কবির কবিতায় শৈল্পিক উপকরণ হিসেবে শীতের প্রাবল্য অনুসৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে জল টি এস এলিয়টের কাব্যে বিশুদ্ধতার প্রতীক। যন্ত্রসভ্যতার করালগ্রাসে সে জল আজ অশুদ্ধ। রফিক আজাদের এ পর্বের কবিতায় নাগরিক জীবনের পঙ্কিলতা উপমিত হয়েছে নোংরা জলে। প্রকৃতির স্বচ্ছ জলের জীবনদায়িনী রূপটি আর নেই, জল এখন মৃত্যু আর স্থিরতার প্রতীক। প্রবহমান জলের স্বচ্ছতা আর নেই, জীবন যেন দুর্গন্ধময় ডোবার জলের মতো স্থির সময়ে আটকে গেছে। বালুকাময় সমুদ্রসৈকত রফিক আজাদের কবিতায় বারংবার এসেছে সৃষ্টি সম্ভাবনাহীন অনূর্বর জীবনের প্রতীক হিসেবে। রফিক আজাদের

কবি-চৈতন্যের অনুভূতির সাযুজ্যে ঘটে নিসর্গের রূপায়ণ। প্রথম পর্বের কবিতায় নেই সুস্থতাবোধ, পরিশীলিত জীবনে পরিতৃপ্তির চিহ্ন। কবির এই নাস্তি-চেতনা প্রকাশিত হয়েছে প্রাকৃতিক বিনষ্টতায়। নিসর্গ-প্রকৃতি আর প্রাণময় সবুজ নয়, প্রাকৃতিক শুষ্কতা প্রাণের সমস্ত সম্ভাবনাকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। বৃক্ষ প্রসঙ্গ আছে কিন্তু সে বৃক্ষ মুণ্ডিত। সজীবতা, প্রাণময়তা, সুস্থতার কোন ইঙ্গিত এই বৃক্ষ থেকে পাওয়া যায় না। পাখির ঠোঁটে নেই নৈসর্গিক স্নিগ্ধতার ছাপ, তার ঠোঁটে লেগে আছে রক্ত; তার কণ্ঠে আর মোলায়েম ব্যঞ্জন নেই, আছে করুণ আর্তনাদ। নির্মল নিসর্গ-প্রকৃতির বিচ্যুতি ঘটিয়ে কবি সম্ভাবনাহীন সময়ের প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করেন। প্রকৃতির সমস্ত গুণাবলি বিনষ্টই এই পর্বের নিসর্গ-চেতনার মৌল প্রবণতা:

খটখটে মৃত্তিকায় শিকড় চারিয়ে দিই,
কিংবা আইয়ো-র শিংয়ের মতো বাঁকানো শৈশব ঘুরে আসি।
শিখাহীন অলৌকিক তোমার আগুনে পুড়ে যায়-
পরিত্যক্ত বাঁশঝাড়, গাছপালা, গোপন বাগান।
(রফিক ২০১৬: ৬২)

স্যাড জেনারেশনের কবি রফিক আজাদ তাঁদের ইশতেহারে সর্বময় নেতির ঘোষণা দিয়ে যেভাবে কাব্যচর্চা শুরু করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত সেখানে স্থির থাকতে পারেননি। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *সীমাবদ্ধ জলে, সীমিত সবুজে* থেকেই ইতিবাচক জীবনবোধের আনুষ্ঠানিক যাত্রা আরম্ভ হলেও *অসম্ভবের পায়ে* থেকেই তার সম্ভাবনা সুপ্ত ছিল। নগরের হতাশ্বাস জীবন থেকে মুক্তির অভিলাষে স্মৃতিময় শৈশবে দেখা নিসর্গ-প্রকৃতি নস্টালজিক চেতনায় উঠে এসেছে। পরবর্তী কাব্যগুলোয় এই নস্টালজিক চেতনা আরো প্রকট হয়েছে।

সীমাবদ্ধ জলে, সীমিত সবুজে

রফিক আজাদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *অসম্ভবের পায়ে* ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হলেও কবিতাগুলো ঘাটের কাব্য-আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত এবং প্রায় সবকটি কবিতা ঘাটের কাব্য-প্রবণতা-জারিত। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *সীমাবদ্ধ জলে, সীমিত সবুজে* (১৯৭৪) ১৯৭১এর স্বাধীনতা-উত্তর কালপর্বে রচিত ও প্রকাশিত। প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকে দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে রফিক আজাদের মানস রূপান্তরের স্বাক্ষর নিসর্গচেতনায় পরিষ্কৃত হয়েছে। নিসর্গ প্রায়শই কাব্যে প্রযুক্ত হয় কবিচৈতন্যে জাগ্রত অনুভবকল্প প্রকাশের উপকরণ হিসেবে। ঘাটের দশকে রফিক আজাদের কাব্য-প্রবণতার মূল সুর সাময়িক বুটের নিচে অবক্ষয়িত জীবনের নাস্তিচেতনা। শৈল্পিক উপকরণ হিসেবেও রফিক আজাদ বোদলেয়ার-এলিয়ট-বাহিত তিরিশের আধুনিক কবিদের নেতিবাদী চেতনাকে আত্মস্থ করেছিলেন। সত্তরের দশকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের পট-পরিবর্তন এবং দীর্ঘ নয়মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা বাঙালি-মানসে এক ধরনের আশাবাদ সঞ্চার করেছিল। রফিক আজাদের মানস-রূপান্তর সেই রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতেই বিবেচ্য। মুক্তিযুদ্ধের মতো বৃহৎ ঘটনা একদিকে তাঁকে জন-সংলগ্ন করে তোলে, অন্যদিকে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত স্বাধীনতা মুক্তিযোদ্ধা কবি রফিক আজাদের মনে সঞ্চার করে প্রদীপ্ত আশাবাদ। পরবর্তী কাব্যগুলোতে সেই আশাবাদের অনুষ্ণেই ব্যাপ্ত হয়েছে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের বিচিত্র অনুভব। রফিক আজাদের কাব্যে নিসর্গ-প্রকৃতি কবিস্বভাবের রূপান্তরের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা পরিগ্রহ করেছে। ঘাটের দশকের কৃত্রিম নাগরিক জৌলুসের মধ্যে কবির দৃষ্টি গ্রামীণ নিসর্গ-প্রকৃতিকে উপেক্ষা করলেও সত্তরের দশক থেকেই তিনি হয়ে ওঠেন প্রকৃতি-সংলগ্ন। শুধু রফিক আজাদ নন, ঘাটের দশকের অধিকাংশ কবির ক্ষেত্রেই এই বক্তব্য প্রযোজ্য। তাঁদের কবিতায় গ্রামীণ নিসর্গের সৌন্দর্যানুভূতির পরিবর্তে

শীত ও রাত্রির চেতনা-সংহারী আবহে নাগরিক নাস্তিবোধ পরিস্ফুট হয়েছে। এই ষাটের কবিরাই যখন সত্তরের দশকে উপনীত হন এবং সত্তরের দশকে যে নবীন কবির আগমন ঘটে উভয় দলের কাব্য-চেতনায় নিসর্গ-প্রকৃতি এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। বেগম আকতার কামাল লিখেছেন:

প্রবীণ কবি আহসান হাবীব, ষাটের কবি মোহাম্মদ রফিক, আবুল হাসান, মুহাম্মদ নূরুল হুদা এবং সমবেতভাবে সত্তরের প্রায় কবিই ব্যবহার করেন দেশজ কৃষ্টি ও কাব্যরীতির উপকরণ, প্রকাশভঙ্গিতে যুক্ত করেন নিসর্গসম্ভূত জীবনসম্পৃক্ত সৌন্দর্যপ্রতিমা এবং প্রাকৃত কবিতার আঙ্গিক। (বেগম আকতার ২০২০: ১৯)

সত্তরের দশকের কাব্য প্রধানত নিসর্গ-অনুষঙ্গী। রফিক আজাদের কবিমানস ষাটের দশকে গড়ে উঠলেও পরবর্তী দশকগুলোর কাব্যমেজাজকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেনি। ষাটের প্রবল নাগরিক কবি রফিক আজাদ, সত্তরের দশকে অনুভব করলেন কৃষক-সত্তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য টান। গ্রাম থেকে উঠে-আসা মধ্যবিত্ত কবি নগরের বিভবৈভব ও জৌলুসে হতে চেয়েছেন আত্মলীন। ব্যর্থ মনোরথে কবি ঘুরে দাঁড়ানোর সাহস ও আশ্রয় খুঁজেছেন গ্রামীণ নিসর্গের কাছে। পেছনে ফেলে আসা কৃষিজীবনের সহজ-সারল্য কবির চৈতন্যে জাগিয়ে রাখে আশার পিদিম:

সম্পূর্ণ বর্জন নয়, গ্রহণে - বর্জনে গ'ড়ে নিই
মানুষের বসবাসযোগ্য চিরস্থায়ী ঘর-বাড়ি;
বহিরঙ্গে নাগরিক- অন্তরঙ্গে অতৃপ্ত কৃষক;
স্থান-কাল পরিপার্শ্বে নিজ হাতে চাষাবাদ করি
সামান্য আপন জমি, বর্গাজমি চষি না কখনো।
(রফিক ২০১৬: ৯৯-১০০)

রফিক আজাদ কবিতায় গ্রামে ফিরে যাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও নাগরিক মানসিকতা মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হন না। গ্রামের নিসর্গ-প্রকৃতির দিকে তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন নগর থেকে, নগরের বিকল্প হিসেবে গ্রাম নয়, গ্রামের সহজ সজীবতা নগরে সঞ্চারিত করার তাগিদে। এ গ্রাম আবার বাস্তব গ্রাম নয়, কবি কল্পনা থেকে উৎসারিত। বাস্তব গ্রাম কতটা রক্ষ, রফিক আজাদের *বিরিশিরি পর্ব*-র কবিতায় তা বিধৃত হয়েছে। এ পর্বে কবি রফিক আজাদের মধ্যে গ্রামীণ ঐতিহ্যে শেকড়ায়িত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় নাগরিক দীর্ঘশ্বাস থেকে। রোমান্টিক কবিকল্পনায় কবি ধারণা করেন প্রকৃতি আর আবহমান ঐতিহ্যে লালিত গ্রামীণ মানুষের নেই কোন দীর্ঘশ্বাস, অপ্রাপ্তি-জনিত দুঃখবোধ। তা একান্তই দূর থেকে দেখা রোমান্টিক কল্পনা।

‘মানব যৌবন ও স্থান-কাল প্রতিবেশ’ কবিতায় নাগরিক কেরানির স্মৃতির ভেতর গ্রামীণ নিসর্গ-প্রকৃতি পরিভ্রমণের বোধ আরো প্রকট হয়ে উঠে। নাগরিক জীবনের ক্লান্তি অবসাদ থেকে মুক্তির অনুষঙ্গ হিসেবেই তাঁর নিসর্গের দিকে অভিগমন। নগরে মানব-সম্পর্কে আন্তরিকতার অভাব তিনি অনুভব করেছেন, দেখেছেন নির্ধূরতা ও কপট ছলনাজাল। তার বিপরীতে নৈসর্গিক প্রকৃতি তাঁর কাছে সততা, স্বচ্ছতা ও কোমলতার অফুরন্ত আধার।

ক্ষমা কর বহমান হে উদার অমেয় বাতাস কাব্যগ্রন্থে রফিক আজাদের পরিবেশ সচেতনার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা কোনো ভুঁইফোঁড় ব্যাপার নয়; সীমাবদ্ধ জলে, সীমিত সবুজে কাব্যগ্রন্থে তার প্রথম স্ফূরণ

ঘটেছে। তবে এ পর্বের বৃক্ষপ্রীতিতে কবির রোমান্টিক চেতনা যতটা সক্রিয়, পরিবেশবাদীচেতনা ততটা নয়। নাগরিক কাঠিন্য ও নিষ্ঠুরতার বিপরীতে কবি কোমলতার আকাঙ্ক্ষায় বৃক্ষের ধারস্তু হয়েছেন। নিয়মের নিষ্ঠুর যান্ত্রিকতা হৃদয়ের সহজতা ও অকৃত্রিমতাকে আবিষ্ট করতে চায়। কবি বৃক্ষের মধ্যে অকৃত্রিম কোমলতা অবলোকন করে হয়ে উঠেন বৃক্ষপ্রেমী:

কাঠুরের ঘরে জন্ম, তবু, পারিনি কঠোর হ'তে:
অবলীলাক্রমে বৃক্ষ কুঠারের আঘাতে-আঘাতে
কেটে ফেলতে প্রাণে লাগে; -পত্র-পুষ্প সুশোভিত বনে
ভুলক্রমে মিশে গেছি প্রাকৃতিক জীবন-প্রবাহে।।
(রফিক ২০১৬: ১০০)

সীমাবদ্ধ জলে, সীমিত সবুজে কাব্যগ্রন্থে রফিক আজাদ প্রথম পর্বের প্রবল নাগরিক সন্তাপ থেকে গ্রামীণ নিসর্গের অভিমুখে যাত্রা করেছেন। সমকালীন স্বদেশের অস্থির ঘটনাপ্রবাহ কবিকে বাস্তবের সীমায় স্থিত করেছে। ফলে পরবর্তী কাব্যে যেমন নিসর্গচেতনায় রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়, এ কাব্যগ্রন্থে তা তেমন প্রকট নয়।

চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া

রফিক আজাদের পরিবর্তিত কবিসত্তার পরিণত কাব্যগ্রন্থ চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া (১৯৭৭)। প্রথম পর্বের কবিতায় আত্মঘোষণার মাধ্যমে সুন্দরের থেকে মুখ ফিরিয়ে অসুন্দরের সাধনায় লিপ্ত-থাকা কবি রফিক আজাদ চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতায়ই চোখ ফেরালেন সুন্দরের দিকে। সমগ্র কাব্যজুড়ে রোমান্টিক অনুভবে কবি নৈসর্গিক সৌন্দর্যের সাধনা করেছেন। নগর ও নাগরিক যন্ত্রণার শাসন এ পর্বেও অবলুপ্ত নয়, কিন্তু নৈসর্গিক সৌন্দর্যের ভেতর কবি খুঁজে পেয়েছেন জীবনের সার্থকতা। সীমাবদ্ধ জলে, সীমিত সবুজে কাব্যগ্রন্থে এই নবলব্ধ অনুভব ক্ষীণ রেখার মতো উপস্থিত, অত্যধিক সমাজ-সংলগ্নতায় বাস্তবতার কাছাকাছি। কিন্তু চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া কাব্যগ্রন্থে রোমান্টিক আতিশয্যে কবি মারণাস্ত্র সভ্যতার বিকল্প হিসেবে নিসর্গ পরিবেষ্টিত চুনিয়া নামক ছোট গ্রামকে স্থাপন করেছেন। নগর থেকে গ্রামের প্রতি তাঁর এই দৃষ্টি পূর্ব-পরিকল্পিত হলেও নিসর্গ-প্রকৃতি স্বরূপে উপস্থিত না হয়ে কবি-প্রকল্পের অংশ হিসেবে চিত্রিত হয়েছে।

রফিক আজাদের প্রথম কাব্যগ্রন্থে কালো ও ধূসর রঙের আধিক্য ক্রমশ সীমাবদ্ধ জলে, সীমিত সবুজ কাব্য থেকেই তা ক্রমশ সবুজে রূপান্তরিত হয়। তাঁর সামগ্রিক কাব্য পরিমণ্ডলে চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া কাব্যগ্রন্থে সবুজের সর্বাধিক ব্যবহার ঘটেছে। সবুজ একদিকে প্রাণ প্রাচুর্যের, অন্যদিকে দেশামাতৃকার প্রতীক। রফিক আজাদের ক্রমশ জাতীয়তাবাদী চেতনায় প্রবেশের স্বাক্ষর এই সবুজময়তা। দ্বিতীয়ত সবুজকে বলা হয় 'বিশ্ব প্রাণের কেন্দ্রীয়ভবন'। (মোহিত ২০১৫: ৮৩) অনাদিকাল থেকে সবুজের মধ্যে ব্যক্ত হয় প্রাণের স্বাভাবিকতা। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতায় মানুষের মননে বর্ধিত ব্যাধির উপশম খুঁজেছেন নির্মল সবুজতায়। নাগরিক ব্যাধির উপশম দিতে পারে কেবল সবুজ প্রকৃতি। পণ্য-সভ্যতার দেন-দরবার, চাটুকারিতা, জোচ্ছুরিতে বিপন্ন কবি-মন নৈসর্গিক সারল্যে অবগাহন করে চিন্তের শান্তি অনুভব করতে চেয়েছেন।

জসীমউদ্দীন তাঁর কাব্যে নগরের বিকল্প জীবনধারা হিসেবে গ্রামকে প্রস্তাব করেছেন, কেননা তাঁর গ্রাম কেবল স্বয়ংসম্পূর্ণই নয়, অনেক ক্ষেত্রে নগরের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। রফিক আজাদের গ্রাম-চেতনায় গ্রামীণ

ক্ষমতা-কাঠামোর জাল-জটিলতা কিংবা উৎপাদনশীল ভূমিকা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। নাগরিক মননের ব্যাধিকে তিনি নৈসর্গ-প্রকৃতির স্পর্শতায় দূরীভূত করতে চান। তাঁর কাব্যে আকর্ষণ নৈসর্গিক পিপাসার মধ্যেও নগর-বাসের অভিজ্ঞতা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করা যায়। ‘তুমি চাও’ কবিতায় রফিক আজাদ শান্তিচ্ছায়াঘন আদিম অরণ্য, জলের গভীরে জ্যোৎস্না, নিধুয়া পাথার, মাটির উনুন, শানকিতে শাদা ভাত, শীতল পাটির সুখ, হাতপাখা, পাখিদের সবুজ সাম্রাজ্য, তৃণের লাবণ্য, পলিময় বীজতলা, আদিগন্ত বৃক্ষের বিস্তার, পরিচ্ছন্ন হৃদসহ যে দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন তাতে নৈসর্গ-প্রকৃতিঘেরা এক সবুজ, কোমল ও সুখী-সমৃদ্ধ গ্রামের ছবি পাঠকের চোখে ভেসে ওঠে। কিন্তু নগরবাসী কবির রোমান্টিক কল্পনার বিপরীত প্রান্তে এসে হাজির হয়:

নোংরা ড্রেন, পচা জল, হলুদ পত্রালি, কুথ, চিমনির ধোঁয়া,
দূষিত বাতাস আর গভীর রাত্রিতে ভারী বুটের আওয়াজ।।
(রফিক ২০১৬: ১৩০)

শৈশবের স্মৃতিঘেরা গ্রাম আর নগরবাসের বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বৈত-সংঘাতে ধ্বস্ত কবি গ্রামকে নস্টালজিয়ার ভেতর দিয়ে পেতে চান। ‘পিছনে ফেলে আসি’, ‘আমার কৈশোর’ প্রভৃতি কবিতায় কবির স্মৃতিপটের ভেতর দিয়ে ভেসে আসে গ্রামীণ নৈসর্গের ছবি। কারাগার-সদৃশ নাগরিক জীবনের উৎপীড়ন, বিনিময় নির্ভর সম্পর্কের দায় এবং মারণাস্ত্র-সভ্যতার হিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে মুক্তি আকাঙ্ক্ষায় কবির কামনা নৈসর্গের আদিম সারল্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে রফিক আজাদের চুনিয়া প্রকল্পের স্বরূপ।

বিংশ-শতাব্দীর প্রথমার্ধে সংঘটিত পরপর দুটি মহাযুদ্ধ, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে দীর্ঘ নয়মাস-ব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, ১৯৫৫ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘকাল আমেরিকা-ভিয়েতনাম যুদ্ধ কবিকে আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে তুলে। বিশ্বসভ্যতার ধ্বংসযজ্ঞ এবং নগর জীবনের যন্ত্রণার বিপরীতে নৈসর্গ-প্রকৃতির ছায়াঘেরা চুনিয়ায় তিনি পান মাতৃ-আশ্রয়। কবি চুনিয়াকে কল্পনা করেছেন ‘আর্কেডিয়া’ রূপে। কবি-কল্পনায় চুনিয়া স্বপ্নের দেশ হলেও এর বাস্তব অস্তিত্ব ইতিহাসে বিদ্যমান। প্রাচীন গ্রিসের পেলোপনিসাসের কেন্দ্রীয় জেলার নাম ছিল আর্কেডিয়া। সমুদ্র ও পর্বত-বেষ্টিত এই ভূখণ্ড ছিল নার্সিসাস ফুল ও আঙুর বাগানের রসসৌরভে ভরপুর। প্রাচীন এই ভূখণ্ড মেঘপালকেরা মেঘ চড়াতো এবং ঝরনা ও বৃক্ষ ছায়ার নিচে নিদ্রা যেত। তাদেরই কণ্ঠে শোনা আর্কেডিয়ার স্বর্গীয় সুখের বিবরণ। রেনেসাঁসের যুগে কবিরা আর্কেডিয়াকে চির-শান্তির দেশ হিসেবে বন্দনা করতেন তাঁদের কাব্যে। রফিক আজাদের কবি-কল্পনায় নৈসর্গিক ছায়া-ঘেরা চুনিয়া হয়ে উঠেছে চিরশান্তির দেশ আর্কেডিয়া। চুনিয়ার অবস্থান যুদ্ধ ও অমানবিকতার বিপক্ষে, শান্তির পক্ষে:

চুনিয়া একটি গ্রাম, ছোট কিন্তু ভেতরে-ভেতরে
খুব শক্তিশালী
মারণাস্ত্রময় সভ্যতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।
মধ্যরাতে চুনিয়া নীরব।
চুনিয়া তো ভালোবাসে শান্তিস্নিগ্ধ পূর্ণিমার চাঁদ,
চুনিয়া প্রকৃত বৌদ্ধ-স্বভাবের নিরিবিলা সবুজ প্রকৃতি;
চুনিয়া যোজনব্যাপী মনোরম আদিবাসী ভূমি।
(রফিক ২০১৬: ১৬৫)

চুনিয়ায় হিংসা নেই, মানুষেরা করে না চিৎকার, চুনিয়া কঠোরতা ভালোবাসে না। অর্থাৎ আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার রুঢ় বাস্তবতায় কবি তাঁর সমস্ত নঞর্থক অনুভবকে কল্পিত চুনিয়ার প্রাকৃতিক সহজতায় মোকাবেলা করতে চান। এক্ষেত্রে রফিক আজাদ রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক চেতনায় পরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি:

রবীন্দ্রনাথের এই যে বিশ্বাস অর্থাৎ প্রকৃতির শান্ত পরিমণ্ডলের মধ্যে কবিকে আবিষ্কার করা যায় তার অর্থ এই যে প্রকৃতি অনন্তকাল ধরে বিদ্যমান এবং সৌন্দর্যের একটি মহার্ঘ শৃঙ্খলার মধ্যে সে পৃথিবীকে আলোকিত এবং তাৎপর্যময় করে রেখেছে এবং কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে না। তাই মানুষের সৃষ্টির রুঢ়তার আক্রমণ থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল হওয়া। (সৈয়দ আলী ১৯৯১: ১০০)

রফিক আজাদের কবিতায় প্রকৃতি (nature) ও সংস্কৃতির (culture) দ্বন্দ্বিকতা বেশ স্পষ্টভাবেই দৃশ্যমান। মানবসৃষ্টি ও মানবচর্চিত জ্ঞান, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, বিশ্বাস, রীতি-নীতি ও সমাজকাঠামোর সমন্বয়ে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে তাতে রয়েছে কৃত্রিম বা যান্ত্রিক নিয়মের বাড়াবাড়ি। বিপরীতে মানবীয় হস্তক্ষেপ বহির্ভূত প্রকৃতির মধ্যে ধরা থাকে অকৃত্রিম সরলতা। মানব সভ্যতার ক্রম-অগ্রসরমানতায় পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে অসংখ্য যুদ্ধ, ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষ-মানুষে প্রতিহিংসা। মানুষকে অনবরত সংস্কৃতিবান (cultured) হয়ে ওঠার যাত্রায় সভ্যতার সংঘাত, যুদ্ধ, প্রতিহিংসা, কৃত্রিমতা ও যান্ত্রিকতাকে বরণ করতে হয়েছে। রফিক আজাদের অবস্থান অবশ্যই সংস্কৃতির বিপরীত প্রান্তে নয়; কিন্তু সংস্কৃতির নামে নাগরিক জীবনে প্রাকৃতিক সহজতা ও অকৃত্রিমতা বিনষ্টিতে তিনি কাতর। নগরে তিনি অবলোকন করেছেন প্রাকৃতিক সরলতার অভাব। মারণাস্ত্র সভ্যতার যুদ্ধনীতি, নিয়মের যান্ত্রিকতা, কৃত্রিম সম্পর্কের স্বার্থনির্ভরতা কবিকে ক্রমশঃ ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। ফলে প্রকৃতির মধ্যেই কবি প্রাণের আরাম অনুভব করেছেন:

আবিষ্কারের-অনুধ্যানে মানবিক অগ্রযাত্রা চলে
সহস্র শতাব্দী ধরে তবু কি অত্যন্ত অসঙ্গত
প্রাকৃতিক আচরণ পরিবেশের প্রভাবে আজ
প্রাকৃতিক সারল্যের রূপান্তর ঘটে-ঘটে খুব
জটিল হয়েছে। মেধায়-মননে বেড়ে মানুষেরা
জটিল হয়েছে খুব বেশি দূর অগ্রসর হতে
পেরেছে কি প্রকৃতির সঙ্গে তিক্ত প্রতিযোগিতায়?
আজও তো দেখতে পাই ভূমিকম্পে কেঁপে-কেঁপে ওঠে
প্রচণ্ড প্রয়াসে-গড়া সভ্যতার নড়বড়ে ভিত।
স্তর-পরস্পরাক্রমে এতোদূর এসেও মানব
কতটুকু এগিয়েছে?
(রফিক ২০১৬: ১৫৩)

তবে শেষ পর্যন্ত রফিক আজাদ নাগরিক রুচিশীল, সংস্কৃতিবান, আধুনিক মানুষ; মানবসভ্যতার প্রগতিতেই তাঁর আস্থা। ফলে আকাঁড়া প্রকৃতিতে তাঁর পূর্ণ ভরসা নেই। বনের গুঁড় প্রাকৃতিকতার চেয়ে পরিপাটি উদ্যানই তাঁর আস্থা: “শব্দকে বিণ্যস্ত করে তবেই সংস্কৃতি,/ তা-না হ’লে শব্দ সে তো মৃত অভিধান;/

বনকে বিন্যস্ত করে তবেই উদ্যান,/না-হ'লে তো বন সে যে শুধু প্রকৃতি” (রফিক ২০১৬: ১৫৩)। রফিক আজাদের কবিচৈতন্যে প্রকৃতি ও সংস্কৃতির দ্বৈতসত্তার উপস্থিতি লক্ষণীয়। তিনি মূলত নাগরিক মানসিকতা লালন করেন, তাঁর মননে-মগজে নগরবাসের অভিজ্ঞতা; প্রকৃতি তাঁর কাছে শৈশবের স্মৃতি, বাস্তবের রূঢ় অভিজ্ঞতা ভুলে থাকার রোমান্টিক ভাববিলাস, বড়জোর নাগরিক পরিসরে নিসর্গ-প্রকৃতির সামান্য ছোঁয়া; কোনোভাবেই নগরের বিকল্প নয়।

সশস্ত্র সুন্দর কাব্যগ্রন্থ থেকে খুব বেশি দূরে নয়

চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ *সশস্ত্র সুন্দর* (১৯৮২) থেকে অষ্টম কাব্যগ্রন্থ *খুব বেশি দূরে নয়* (১৯৮৯) পর্যন্ত রফিক আজাদের নিসর্গ-চেতনার বহুস্তর অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ কালপর্ব সামরিক শাসনের অপরূপতায় সম্ভূত। দীর্ঘ নয়মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অর্জিত স্বাধীনতা পরাহত হলে মুক্তিযোদ্ধা-কবি রফিক আজাদের কবি-মানস বিদীর্ণ হয় স্বপ্নভঙ্গের ব্যর্থতাবোধে। রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে তাঁর নৈসর্গিক সৌন্দর্যবোধ রূপান্তরিত হয়। রাষ্ট্রিক শোষণ, বাক-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং প্রশাসনের সামরিকীকরণের ফলে বাঙালির জনজীবনে যে বিপর্যয় নেমে আসে, প্রাণহীন, বর্ণহীন, শুষ্ক নৈসর্গিক অনুষ্ণে রফিক সে বাস্তবতাকে প্রতীকায়িত করেন। তবে পূর্ববর্তী কাব্যে নাগরিক সন্তাপ থেকে মুক্তির প্রয়াসে তিনি গ্রামীণ নিসর্গে যে শান্তির সুবাস অনুভব করেছেন এ পর্বেও সে ধারা অব্যাহত। একদিকে তিনি নিসর্গ-প্রকৃতির স্বাভাবিকতার বিনষ্টি দেখিয়ে সমকালীন সমাজ রাষ্ট্রের দক্ষ ক্ষতকে উন্মোচন করেছেন, অন্যদিকে সামরিক অপরূপতায় ধস্ত জীবনের পরিত্রাণ খুঁজেছেন গ্রামীণ নিসর্গের সবুজ ছায়াতলে। রফিকউল্লাহ খান লিখেছেন:

‘সশস্ত্র সুন্দর’ কাব্যগ্রন্থ থেকে রফিক আজাদ কবিতার নিত্যনতুন রূপ- সন্ধান তৎপর। জীবনের প্রথাগত রূপ গুণগত পরিবর্তন ছাড়া যেমন কেবলই বংশবিস্তার করতে থাকে, রফিক আজাদের কবিতাও তেমনি পূর্বতন স্বপ্নবৃত্তের মধ্যেই নতুন নতুন বৃক্ষরাজির সৃষ্টি করে। সেই সব বৃক্ষ কখনও পত্রপুষ্পময়, কখনও বর্ণহীন-রূপহীন অনৈসর্গিক শূন্যতার প্রতীক। এ-পর্যায়ে এসে স্বাধীনতা নামক বোধটি তাঁর কাছে হয়ে ওঠে নির্বন্ধক শব্দমালা, নিজের আত্মবিশ্বাসে ক্রমাগত ফাটল ধরতে থাকে। (রফিকউল্লাহ ২০০২: ১৬০)

১৯৭১এর স্বাধীনতা বাঙালি-মানসে সম্ভাবনার যে আশা সঞ্চার করেছিল, স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই সে আশা ব্যর্থতার বালুচরে মুখ খুবড়ে পড়ে। প্রাণের জোয়ারে যে পুণ্যতোয়া নদী অবিরাম প্রবাহে বয়ে নিত পরিশুদ্ধ জল, সে নদী আজ ‘স্রোতাবেগহীন জলজ শ্যাওলা’য় পরিণত। নদীর গতিহীনতার সময়ের অপরূপতার প্রতীকী প্রকাশ। নৈসর্গিক অনুষ্ণে কবি স্বদেশের মরুময় সম্ভাবনাহীনতাকে প্রকট করে তুলেন। এক্ষেত্রে রফিক আজাদের মধ্যে টি এস এলিয়টের *The Waste Land* (১৯২২) কাব্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। টি এস এলিয়ট আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার অবক্ষয়কে যেভাবে পোড়ো জমির প্রতীকে উপস্থাপন করেছেন, রফিক আজাদও সামরিক শাসনের অপরূপতাকে বৃষ্টিপাতহীন অনূর্বরতার অনুষ্ণে ব্যক্ত করেন:

বৃষ্টিপাতহীন খরায় জ্বলছে ক্ষেত,
উর্বরতাহীন ভূমি ফেটে-ফেটে
হয়েছে চৌচির! ...
প্রতিটি শস্যের মাঠ গ্রাস ক’রে আছে

অনুর্বর বালি;- বিস্তারিত হচ্ছে ক্রমে
মরুভূমি!
মৌসুমী বায়ুর আশীর্বাদ থেকে রিক্ত
এই শ্যাম শাম্পাধ্বলে যেন আর তৃণগুল্ম নেই,
বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে নেই দিগন্ত-বিস্তৃত গোচারণযোগ্য
কোনো ভূমি,
(রফিক ২০১৬: ১৭০)

বৈশ্বিক যুদ্ধনীতি ও স্বদেশের সামরিক আত্মসনের পরিপ্রেক্ষিতে রফিক আজাদ নৈসর্গিক বিনষ্টির দিকটি প্রকট হয়ে উঠেছে। আবার যুদ্ধনীতি ও সামরিক বুটের বিপরীতে তিনি নিসর্গ-প্রকৃতির পক্ষাবলম্বন করেছেন। *সশস্ত্র সুন্দর* কাব্যের ‘সার্বভৌম পাঁচটি আঙুল’ কবিতায় যুদ্ধ ও সন্ত্রাসের বিপরীতে চুনিয়া প্রকল্পের আবহ দৃশ্যমান। রফিক আজাদের নিসর্গ মারণাস্ত্র সভ্যতার ভারী কামানের বিপরীতে দাঁড়িয়ে যায়। ‘সোনালি কাঁকড়ার দাঁড়া’, ‘জেগে উঠবে কবে, হে কুসুম’ প্রভৃতি কবিতায় কবি নিসর্গ-প্রকৃতিকে যুদ্ধনীতি, সামরিক শাসন, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ক্ষমতার অন্ধ মোহে যারা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও বাক-স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে, তাদের বোধোদয়ের জন্য কুসুমের কাছে কবির প্রার্থনা:

বিলাও সৌরভ অন্ধ ও বধির হ্রাণেন্দ্রিয়হীন
একনায়কের কাঁটাতার-ঘেরা ক্ষুদ্র বাসভূমে!
(রফিক ২০১৬: ১৯৪)

একদিকে সামরিক শাসনের অবরুদ্ধতা, অন্যদিকে অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতায় মধ্যবিত্ত কবির রুদ্ধশ্বাস জীবন। *সশস্ত্র সুন্দর*, *হাতুড়ির নিচে জীবন* প্রভৃতি কাব্যের একাধিক কবিতায় রাষ্ট্রের সামরিকনীতি, মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক টানাপোড়েন ও দৈনন্দিন জীবনের গ্লানি মোচনের অবলম্বন হয়ে উঠে নারী ও প্রকৃতি। এ পর্বে রফিক আজাদের কবিতায় নারী ও প্রকৃতির সমান্তরাল উপস্থাপন নিসর্গ-নারীবাদ (Eco-feminism) তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা অধিকতর কার্যকর হতে পারে। পুর্জিবাদী সভ্যতা নারী ও প্রকৃতি প্রতি শোষণ সমভাবে অব্যাহত রাখে। অথচ ভোগসর্বস্ব পুর্জিবাদী সভ্যতার অমানবিকতার বিকল্প হিসেবে নারী ও প্রকৃতির আদিম সরলতা হতে পারে যথোপযুক্ত বিকল্প ব্যবস্থা। ফলে ‘পুরুষ-সৃষ্ট’ মারণাস্ত্র সভ্যতার বিপরীত প্রকল্প হিসেবে নারী ও প্রকৃতি কবির প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠে। কবি সগর্বে এই দুইয়ের কাছে নিজের দায়বদ্ধতার কথা স্বীকার করেন। কেননা নারী ও নিসর্গ ভিন্ন আর কোনো কিছুই কবিকে স্বস্তি দিতে পারে না। ‘বৃষ্টিভেজা বৃক্ষ’ এবং ‘শ্যামাঙ্গী রমণী’র স্পর্শ লাভ করে কবি ভুলে থাকতে চান প্রাত্যহিক জীবনের রুঢ় বাস্তবতাকে। কবি নারীকে অনুভব করেন নৈসর্গিক কোমলতায়। রবীন্দ্রনাথের মতোই এই কবি মনে করেন পুরুষের সৃষ্ট সভ্যতা নিষ্ঠুরতায় রক্তাক্ত। কেবলমাত্র নারীর স্নিগ্ধ হাতের স্পর্শেই পৃথিবী ফিরে পেতে পারে তার আদিম সরলতা।

এক জীবন (১৯৮৩) কাব্যেও এই নৈসর্গিক সন্ত্রাস পরিদৃশ্যমান। সবুজ প্রকৃতির বিপর্যস্ত চিত্রকল্পে কবি সময়ের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে শিল্পিত করেন। সামরিক বুটের নিচে জন্মে না তৃণগুল্ম, সবুজতা হারায় কোমল ঘাস, লভভন্ড হয় গোলাপ বাগান। কবির নিসর্গচেতনা সমকালীন রাজনৈতিক শোষণের সমান্তরালে প্রবহমান। সবুজকে কবি গ্রহণ করেন প্রাণ-প্রাচুর্যের অনুষঙ্গে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে কবির নিসর্গচেতনা সবুজতা হারিয়ে হয়ে ওঠে বিবর্ণ। এই বিবর্ণতা সামরিক শাসনে বিপর্যস্ত কবির স্বদেশের প্রকৃত রূপ। কবিতায়

রফিক আজাদ গদ্যের কঠোর পুরুষ নন, পদ্যের কোমল কবি। কবিতাকে আজন্ম সুন্দর ও কোমলের সমার্থক করে তুলতে চাওয়া কবির নিসর্গ চেতনায় ঢুকে গেছে গদ্যের ঘুণ।

খুব বেশি দূরে নয় কাব্যের নাম কবিতা ‘খুব বেশি দূরে নয়’, ‘ঘরবাড়ি বলতেই’, ‘যে আসবে সে নিঃশব্দে আসুক’ প্রভৃতি কবিতায় নগর ছেড়ে গ্রামাভিমুখী কবির দেখা মেলে, যিনি নিসর্গের কাছে করেছেন শান্ত সমর্পণ। নগর কবিকে শান্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। নাগরিক বোধ নিয়ে এ পর্বেও তিনি নিসর্গ পরিভ্রমণ অব্যাহত রেখেছেন। নগর প্রতিবেশে ক্লান্তি নিরসনের কোনো উপকরণ কবি পান না। নগরে আছে ‘ন্যূজপীঠ পানশালা’। কিন্তু পানশালা অন্তর পরিতৃপ্তির বদলে ক্লান্ত করে তোলে। পরিতৃপ্তির জন্য তাকে যেতে হয় প্রকৃতির কাছে। সামরিক শাসনের পাথর অনুভূতি থেকে পরিত্রাণের জন্য কবির এই নিসর্গ-বিচরণ। প্রাক-মুক্তিযুদ্ধ পর্বেও সামরিক শাসনামল ও স্বাধীনতা-উত্তর সামরিক শাসনামলে কবিমানসের মৌলিক পার্থক্য সুস্পষ্ট। উভয় পর্বেই শোষণ আছে, শোষণের অনুভব আছে। কিন্তু আইয়ুবী কালো দশকে আত্মপীড়ন ছিল, আত্মমুক্তি ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে কবির আত্মমুক্তির সুনির্দিষ্ট গন্তব্য গ্রামীণ নিসর্গ-প্রকৃতি।

ক্ষমা কর বহমান হে উদার অমেয় বাতাস কাব্যগ্রন্থ থেকে কণ্ঠে তুলে আনতে চাই

ক্ষমা কর বহমান হে উদার অমেয় বাতাস (১৯৯২) থেকে কণ্ঠে তুলে আনতে চাই (১৯৯৭) কাব্যগ্রন্থ পর্যন্ত রফিক আজাদের কবি-মানসে নিসর্গ-প্রকৃতি চেতনার ভিন্নমাত্রা পরিলক্ষিত হয়। নৈসর্গিক সৌন্দর্য সম্পর্কিত রোমান্টিকবোধ এবং নাগরিক সভ্যতার বিপরীতে প্রকৃতিকে আদিম অমল সারল্যের আধার কল্পনা এ পর্বে অব্যাহত, তবে প্রধান হয়ে উঠেছে রফিক আজাদের পরিবেশবাদী চেতনা। ১৯৬২ সালে আমেরিকার রাসেল কারসনের *Silent Spring* গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর বিশ্বজুড়ে পরিবেশ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় সাহিত্যে প্রকৃতি-বন্দনা প্রাচীনকাল থেকে অব্যাহত থাকলেও বিংশ-শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে প্রকৃতি পরিবেশবাদী সচেতনতায় বিধৃত হতে থাকে। রফিক আজাদ বাংলা সাহিত্যে সেই ধারার একজন প্রধান কবি। রফিক আজাদের প্রকৃতিভাবনার এই রূপান্তর বোঝার জন্য বৈশ্বিক জলবায়ু সংকট সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মহলে বিশেষত পাশ্চাত্যে যে ভাবনার উদ্বেক হয়েছিল তার স্বরূপ অনুধাবন করা প্রয়োজন।

নব্বইয়ের দশকের কাব্য প্রবণতার প্রধান দিক প্রকৃতির প্রতি রোমান্টিক দৃষ্টির পরিবর্তে প্রকৃতির সংরক্ষণের প্রতি কবিদের গভীর দায়বদ্ধতা। বিংশ-শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকেই বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডলে ‘ইকোলজি’ চর্চার সূত্রপাত হলেও নব্বইয়ের দশকের সাহিত্যঙ্গনে ‘Ecocriticism’ শব্দটি তাত্ত্বিক মাত্রা লাভ করে। ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত মেরিল গ্লটফেল্টি ও হ্যারল্ড ফ্রমের *The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology* গ্রন্থে ইকোক্রিটিসিজম সম্পর্কে লেখা হয়:

Simply put, ecocriticism is the study of the relationship between literature and the physical environment. Just as feminist criticism examines language and literature from a gender-conscious perspective, and Marxist criticism brings an awareness for modes of production and economic class to its reading of texts, ecocriticism takes an earth-centered approach to literary studies. (Glottfelty & Fromm, 1996: xviii)

কবিতায় নিসর্গ-প্রকৃতির ব্যবহার কাব্যচর্চার আদিকাল থেকে হলেও মানুষ তার কেন্দ্রীয় অবস্থান ছাড়েনি।

ধর্মগ্রন্থ থেকে রেনেসাঁস, মানব সভ্যতার বিবর্তনের প্রতিটি ধাপে মানুষ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছে। ইউরোপের ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। পৃথিবীর তাবৎ ধর্ম মানুষের যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেছে ইউরোপীয় আলোকায়নের কালে সেটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পায়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই প্রথম ‘অ্যাক্সোপোসেন্দ্রিজম’ ভেঙে ‘আর্থ সেন্টারড অ্যাপ্রোচ’ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এর ফলে মানব সভ্যতার বিকাশের প্রারম্ভ থেকেই যে মানুষ নিজের ভালো জীবনযাপনের (Good life) জন্য প্রকৃতির অপরিমেয় ক্ষতিসাধন করেছে তার বিরুদ্ধে অবস্থান সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর সব কিছুর কেন্দ্রে মানুষ নিজেকে স্থাপন করে গ্রহের অপরাপর জীব ও বস্তুনিচয়ের উপর কর্তৃত্বকে ভেঙে দিয়ে এই ডিসকোর্স মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে এক সমান্তরাল সম্পর্ক স্থাপন করে। পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষের আগমন অনেক পরে হলেও মানুষ সর্বদা গ্রহীয় ইতিহাসের কেন্দ্রে থেকেছে। ষাট-সত্তরের দশকে মিশেল ফুকো (১৯২৬-১৯৮৪), জঁাক দেরিদা (১৯৩০-২০০৪), গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিডাক (১৯৪২-) প্রমুখ তাত্ত্বিকদের প্রভাবে ইতিহাসের কর্তাসত্তা সমালোচিত হয়েছে। এর প্রভাবও ‘আর্থ সেন্দ্রিজম’ চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে।

১৯৬২ সালে আমেরিকান লেখক *Rachel Carson Gi Silent Spring* গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রথম পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হতে থাকে। ১৯৮০ এর দিকে নাসার বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেন বিশ্বের তাপমাত্রা পূর্বের তুলনায় অধিক হারে বাড়ছে, যা মানুষসহ গোটা গ্রহের জন্যই বিপজ্জনক। পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে পৃথিবীর ওজন স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং গ্রিন হাউস ইফেক্টের ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক আবহাওয়া পরিবর্তন দল International Panel for Climate Change (IPCC) এর তৃতীয় রিপোর্ট অনুযায়ী ২০৫০ সালের মধ্যে পৃথিবীর অন্যান্য নিম্নাঞ্চলের মতোই বাংলাদেশের এক পঞ্চমাংশ সমুদ্রে তলিয়ে যাবে, দুই কোটি লোক উদ্বাস্তু হবে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে পৃথিবীর ঋতুচক্রের যেমন পরিবর্তন হয়েছে তেমনি পৃথিবীতে ঘন ঘন মহামারী অতিমারি সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে, কোভিড-১৯ যার সর্বশেষ প্রমাণ।

দীপেশ চক্রবর্তী লিখেছেন: “পরিবেশ বিপর্যয় এবং আমাদের সংসারের রমরমা খুব জড়িত।” (দীপেশ ২০২১: ৫৪) প্রকৃতির উপর মানুষের অন্তহীন শোষণের জন্য দায়ি তার ভালো জীবনযাপন (Good Life) কামনা-জাত পুঁজি অর্থনীতি ও মাত্রাতিরিক্ত যন্ত্রনির্ভরশীলতা। পুঁজিবাদের ভোগবাদী প্রবণতায় মানুষ উন্নত জীবনযাপনের নামে প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্যকে বিপর্যস্ত করে তোলে। কার্ল মার্কস কথিত পুঁজির দ্বন্দ্ব আজ শুধু শ্রেণি-সংগ্রামে সীমাবদ্ধ নেই, এ সংগ্রাম আজ প্রকৃতিতেও প্রসারিত। আদিত্য নিগম লিখেছেন:

পুঁজির দ্বন্দ্ব আজ শুধু ‘আধুনিক শ্রমিক শ্রেণির’ সাথে নয়; বরঞ্চ ‘খোদ জীবন’ (life itself)-এর সাথে। আদিবাসী বা indigenous people সহ মানব সমাজের সমস্ত অংশের সাথে তো বটেই; তার সংঘাত আজ পশুপাখি, জন্তু জানোয়ার, গাছপালা, প্রকৃতি- সবার সাথে। (আদিত্য ২০২৩: ১৯)

নয়া উপনিবেশবাদী অর্থব্যবস্থায় প্রকৃতি এতটাই বিপর্যস্ত হয়েছে যে, গত হাজার-হাজার বছরে এই গ্রহের যতটা ক্ষতি হয়েছে, মাত্র কয়েকশ বছরে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব থাকবে কি-না বা কতদিন থাকবে তা নিয়ে গুরু হয়েছে সংশয়।

প্রকৃতির স্বাভাবিকতা বিনষ্টির জন্য প্রধানত ধনী রাষ্ট্রগুলো দায়ী হলেও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় দরিদ্র দেশের জনগণ। তবে এই সংকট আজ আর শুধু দরিদ্র দেশের সংকট নয়, সমগ্র গ্রহের সংকট। এই সংকট নিরসনে সমগ্র মানবজাতির সচেতনতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সাহিত্য যেহেতু মানুষের জীবন

পরিধির মধ্যে কাজ করে, তাই পরিবেশবাদী চিন্তা সমগ্র বিশ্বের সাহিত্যেই গুরুত্ব সহকারে চর্চিত। তবে পূর্ববর্তী কাব্য-অনুধ্যানে প্রকৃতি যে রোমান্টিক অনুভবে সৌন্দর্যের আধাররূপে চিত্রিত হয়েছে পরিবেশবাদী চিন্তায় সে দিকটি অনুপস্থিত। আসন্ন বিপর্যয় থেকে গ্রহকে রক্ষা করতে সচেতন প্রয়াস হিসেবে সাহিত্যিকেরা তাঁদের সৃষ্টিকর্মে প্রকৃতিকে তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশের কাব্য ধারায় যারা পরিবেশবাদী সচেতন চিন্তা-চালিত হয়ে নিসর্গ-প্রকৃতির প্রতি অমোঘ প্রীতি প্রদর্শন করেছেন রফিক আজাদ তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান কবি। পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রভাব থেকে বাংলাদেশও মুক্ত নয়। প্রতিটি দেশে যেখানে গড় বনাঞ্চল থাকা প্রয়োজন ২৫%, সেখানে বাংলাদেশের আছে ১৭%। এরই মধ্যে চলছে ক্রমাগত বৃক্ষ-নিধন। রফিক আজাদ তাঁর কবিতায় বৃক্ষ-নিধনের বিরুদ্ধে একপ্রকার শৈল্পিক সংগ্রাম চালিয়েছেন। তবে কাব্যচর্চা প্রারম্ভিক পর্যায়েই তিনি পরিবেশবাদী হয়ে ওঠেননি, তাঁর কবিমানস বিবর্তনের বিশেষ পর্যায়ে তিনি পরিবেশবাদী কাব্যচর্চায় ব্যাপ্ত হয়েছেন।

রোমান্টিকদের সঙ্গে পরিবেশবাদী কবিদের প্রকৃতি চেতনার পার্থক্য হলো রোমান্টিক কবিরা এক ধরনের মরমীবাদ বা অতীন্দ্রিয়বোধ দ্বারা চালিত হন, বিপরীতে পরিবেশ সচেতন কবির চৈতন্য নিয়ন্ত্রিত বৈজ্ঞানিক চিন্তা দ্বারা। টেরি ঈগলটন রোমান্টিকদের প্রাথমিক পর্বের প্রকৃতি-প্রীতিকে রাজনৈতিক তৎপরতা বলে উল্লেখ করেছেন। পরিবেশবাদী তাত্ত্বিক উইলিয়াম হাওয়ার্থও পরিবেশবাদী সাহিত্যকে সক্রিয় রাজনীতির অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছেন (শান্তনু ২০২৪: ২৮)। নগরায়ণের ফলে প্রকৃতির বিপর্যয় ঠেকাতে রোমান্টিক কবিরা প্রকৃতিকে মনে করেছেন আনন্দ ও সারল্যের উৎসার। বিষময় নগরের বিপরীতে গ্রামীণ নিসর্গই তাদের স্বর্গভূমি। পরিবেশবাদী কবিদের চেতনায় প্রকৃতি আর কাল্পনিক স্বর্গভূমি নয়, ভাবালুতাবর্জিত বস্তুপ্রকৃতি তাঁদের আলোচনার লক্ষ্য। মুনাফা-নির্ভর সভ্যতার প্রতিহিংসায় তাঁরা আর দূরবর্তী প্রকৃতির কোলে কাল্পনিক আশ্রয় নেন না; বরং যে বা যারা বস্তুপ্রকৃতির ক্ষতিসাধন করে তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেন। সভ্যতার সূচনা থেকে মানুষকে পৃথিবীর কেন্দ্রে স্থাপন করে প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাতের যে রেওয়াজ ছিল, রেনেসাঁসের কালে যা বৈজ্ঞানিক বৈধতা পেয়েছিল, পরিবেশবাদী কবিরা তার বিরোধিতা করে পরিবেশ ও মানুষের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্কে তুলে ধরেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন ‘আপন মনের মাধুরী মিশায়ে’ প্রকৃতিকে বিচিত্র রঙে রাঙিয়ে প্রকৃতির উপর মানবের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, পরিবেশবাদী কবিরা তা না করে প্রকৃতি ও মানুষের আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতে তাকে মূল্যায়ন করেন।

ক্ষমা কর বহমান হে উদার অমেয় বাতাস কাব্যগ্রন্থের নামকরণ এবং কাব্যে অন্তর্ভুক্ত কবিতায় পূর্ববর্তী ধারার রোমান্টিকবোধ ক্ষীণ হয়ে পরিবেশবাদী চেতনা প্রধান হয়ে উঠেছে। জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে বৈশ্বিক উদ্বেগ কবিকে এতটাই বিচলিত করেছে যে শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী প্রকৃতির উপর মানুষের অপরিমেয় ধ্বংসযজ্ঞের জন্য কবি এখানে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন। এ ক্ষমাপ্রার্থনা অনিবার্য ছিল, কারণ প্রকৃতির ওপর ন্যস্ত অনাচারের প্রতিক্রিয়া সে দেখানো শুরু করেছে। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটেছে, পৃথিবীর সবুজ শীতলতা ক্রমেই হয়েছে অপসূর্যমান। ধনতান্ত্রিক সভ্যতায় মানুষ তার ভালো জীবন (good life) কামনায় প্রকৃতির স্বাভাবিকতা বিনষ্ট করেছে বলেই কবির বেদনা:

দুঃখিত ও অনুতপ্ত আমি করজোড়ে ক্ষমা চাই:
‘ক্ষমা করো বহমান হে উদার অমেয় বাতাস;
ক্ষমা চাই - লতাগুল্মময় বনভূমি, ক্ষমা করো
দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশ দূষিত করেছি আমি,
এই গ্রহ ব্যোপে আছে আমারই তো সহোদর সব

মানব সন্তান - আমি নিজে নিধন করেছি বৃক্ষ,
উজাড় করেছি বন: পৃথিবীর প্রিয় ফুসফুস!
সুপেয় জলের নদী বারবার করেছি দূষিত,
অহোদে আমারও হাতে উঠে ঐ আসেনি কুঠার?
জলে নেমে তছনছ করিনি কি জলের সংসার?
(রফিক ২০১৬: ৩২৯)

প্রকৃতির অরণ্য, বৃক্ষ, জল, পাখি, পতঙ্গ প্রভৃতির নাম ধরে ধরে কবির এই অসহায় ক্ষমাপ্রার্থনা মানবকেন্দ্রিক সভ্যতার যে মহাবয়ান তা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে, মানুষ হারায় তার কর্তৃত্বের অহংকার। ক্ষমা প্রার্থনার গূঢ়ার্থ হলো কবি প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের কর্তৃত্ব নয়, বরং উভয়ের সহাবস্থান কামনা করেন। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সহাবস্থান কামনার কারণ গ্রহের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা। নোয়াম চমস্কি লিখেছেন:

পৃথিবীর দেশে দেশে নয়া উদারতাবাদী নিপীড়ন। কোনো শনাক্তযোগ্য ধরনে পৃথিবীতে মানব জীবন থাকবে কি থাকবে না সে ব্যাপারে আমাদের বর্তমান প্রজন্মকে মনস্তির করতে হবে। নয়া উদারতাবাদের বর্তমান পর্বেই পৃথিবীর বড় অংশ বসবাসের অযোগ্য হয়ে গেছে। (নোয়াম ২০২৩: ২৫০)

গণতান্ত্রিক ও মারণাস্ত্র সভ্যতায় মানুষের উগ্রতা-ভোগবাদ প্রকৃতি ধ্বংসের জন্য অনেকাংশে দায়ী। রফিক আজাদের মতে, গ্রহীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে প্রকৃতির স্বাভাবিকতা রক্ষা করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রকৃতি থেকে মানবিক হওয়ার পাঠ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বৃক্ষ এই গ্রহের স্বাভাবিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে। একটি দেশের ভূমির শতকরা ২৫% বনাঞ্চল থাকা প্রয়োজন কিন্তু বাংলাদেশসহ অধিকাংশ দেশে সে পরিমাণ বনাঞ্চল নেই। একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অন্যদিকে কল-কারখানার কারণে প্রতিনিয়ত বনভূমি উজাড় হচ্ছে। ফলে আধুনিক পণ্য-সভ্যতা ও প্রকৃতির দূরত্ব ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। পরিবেশ প্রকৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ এবং গ্রহের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে রফিক আজাদ তাঁর কাব্যে বৃক্ষ-নিধনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। তিনি দুর্বৃত্তদের হাত থেকে প্রকৃতিকে পরম যত্নে আগলে রাখার প্রতিশ্রুতি দেন:

জননী বৃক্ষের বুক খালি হচ্ছে দুর্বৃত্তের হাতে
প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে - অসম্ভব দ্রুত।
প্রত্যহই হচ্ছে গুম-খুন অসংখ্য সেগুনশিশু ...
টুনটুনি পাখির জন্যে, ব্যাঙ ও সাপের জন্যে, আর
অতিথি পাখির জন্যে দেড় লক্ষ বর্গ কি. মি. চাই,
মায়ের আদরে-যত্নে আমি এই অরণ্য সামলাবো-
অযুত নিযুত কণ্ঠে 'মা' ডাক শুনবো প্রাণ ভরে!
(রফিক ২০১৬: ৩৫১)

এ পর্বেও কবি নাগরিক যন্ত্রণার বিপরীতে প্রাকৃতিক অমলতায় অবগাহন করে পরিতৃপ্ত হবার বাসনা ব্যক্ত করেন, তবে গভীর বেদনায় উপলব্ধি করেন ভোগবাদী সভ্যতায় মানুষ কীভাবে ভোগের নামে ক্রমে প্রকৃতির অমলতা বিনষ্ট করেছে। প্রকৃতির এই বিষাক্ত রূপের জন্য মূলত মানুষ দায়ী। নিজেদের সাময়িক সুখের ফাঁদে পড়ে মানুষ একই সঙ্গে প্রকৃতির স্বাভাবিকতা বিনষ্ট করছে এবং এর মধ্য দিয়ে তার নিজের এবং গ্রহের সর্বনাশ করছে। ভোগবাদী সভ্যতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে কবি প্রাণ-প্রকৃতির প্রতি গভীর দায়বোধ অনুভব করেন।

বিরিশিরি পর্ব

বিরিশিরি পর্ব কাব্যে রফিক আজাদের সামগ্রিক কাব্য বোধের রূপান্তর লক্ষ করা যায়। গ্রামীণ-নৈসর্গের আবহে রফিক আজাদ বেড়ে উঠলেও তাঁর কবি-মানসের প্রস্তুতি ও বিকাশ প্রধানত শাহরিক পটভূমিতে। দ্বিতীয় কাব্য সীমাবদ্ধ জলে, সীমিত সবুজে থেকে বিরিশিরি পর্ব কাব্যের পূর্ব পর্যন্ত রফিক আজাদ বসবাস সূত্রে পুরোদস্তুর নাগরিক। তাঁর কাব্যে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের প্রতি প্রবল আকৃতি সত্ত্বেও নাগরিক মানসের অনুভব দুর্বল নয়। নগর থেকে গ্রামীণ নৈসর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করায়, তাঁর নৈসর্গিক অনুভব অনেকটা রোমান্টিকতা আক্রান্ত। নাগরিক যন্ত্রণা, অপ্রাপ্তি ও প্রাত্যহিক জীবনের খেদ থেকে পরিত্রাণের জন্য রফিক আজাদ নৈসর্গিক শীতলতায় অবগাহন করেছেন। নৈসর্গ এখানে দূরবর্তী মরীচিকা, কবি কল্পনাই শীতলতা অনুভবের রসদ জুগিয়েছে। কিন্তু বিরিশিরি পর্ব এ রফিক আজাদ আর নগরবাসী নন। বিরিশিরি উপজাতীয় কালচার একাডেমির প্রধান হিসেবে তিনি অবস্থান করেছেন নেত্রকোণা জেলার বিরিশিরি অঞ্চলে।

স্থানীয় গারো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সঙ্গে রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়তা অনুভব করলেও কাব্যে ব্যবহৃত নৈসর্গিক উপকরণে নির্বাসন-দণ্ডের অনুভব সুস্পষ্ট। নগরে থাকাকালে তাঁর গ্রামে ফেরার প্রবল আকৃতি ছিল, কারণ তিনি নগরের মুখোমুখি হতে পারেননি। অথচ বিরিশিরিতে গিয়ে গ্রামকে নির্বাসন বলে মনে হলে তিনি উপলব্ধি করেন এটি যেন তাঁর নিয়তি:

নিয়তি এনেছে টেনে এই এইখানে,
সোমেশ্বরী তীরে, শুষ্ক বালিয়াড়ি আর কাশবন
ছাড়া কিচ্ছু নেই; সীমান্তের ওই পারে
সাজানো মেঘের সারি নয়, স্তরে-স্তরে
গারো পাহাড়ের শ্রেণী, এই শুষ্ক বিশীর্ণ প্রান্তর -
আমার গৌফের মতো - বিরিশিরি নামটি সুন্দর,
না দেখা না জানা এতোটুকু নামের শব্দের মোহে
এসে তো পড়েছি এইখানে- হয়তো বা-
তাতারাবুগা ইচ্ছে করেছিলো, তাই
পূর্বপুরুষের ঋণ শোধ ছিলো কপালে আমার!
(রফিক ২০১৬: ৪২১)

এখানে অভিমানের সুর স্পষ্ট। শুষ্ক-বালুময় প্রকৃতিতে কবি পূর্বপুরুষের ঋণশোধ করতে এখানে এসেছেন, স্বেচ্ছায় নয়; বরং তাতারাবুগার ইচ্ছায়। তাতারাবুগাই এখানে কবির নিয়তি অর্থে ব্যবহৃত। বহুল আকাজিক গ্রামীণ নৈসর্গে এসে গ্রাম সম্পর্কে কবির মধ্যে জাগ্রত হয়েছে বাস্তবতাবোধ। পূর্বে নগরে থেকে সুদূরবর্তী গ্রামের প্রতি যে ইতিবাচক কল্পনা তাঁর ছিল, বিরিশিরিতে বসে গ্রামের কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই সহজ-সরল ইতিবাচকতা আর অনুভব করতে পারছেন না তিনি।

কাজেই বিরিশিরি পর্ব-এর নৈসর্গিক অনুভব নেতিবাচকতায় উৎসারিত। যে নদী-জল ছিল প্রশান্তির আধার, প্রতাপ হৃদয়কে শীতল করার উপকরণ, সেই নদী আর জল আজ নেতিবাচকতার অনুঘটক উপস্থিত। নগর ও পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার নৈঃসঙ্গ্যানুভূতি যেন মৃত্যুময় রূপে প্রতীয়মান। কবির আকৃতি এবার নগরে ফেরার। নগর ছেড়ে এই গ্রামীণ নির্বাসনকে কবি বোকামির দণ্ড মনে করেন। বিরিশিরিতে এসে কবি নিজেকে বনফুল ভাবছেন:

আমি শুধু ব্রাত্য ও বিব্রত
এক তুচ্ছ বনফুল, বেমানান এই ভূ-বাংলায়
(রফিক ২০১৬: ৪৩৩)

এ কবিতায়ও অভিমানের সুর প্রবল। কবি ব্যর্থ, কারণ তিনি বনফুল। সফলতার মানদণ্ড গোলাপ, যা হতে না-পারা তাঁর অভিমানের কারণ। নগরে থাকাবস্থায় গোলাপের মুখোমুখি হতে না-পারার ব্যর্থতাবোধ থেকে আসতে চেয়েছিলেন গ্রামে, বনফুলের কাছে, হয়তো শান্তি পাবেন এই রোমান্টিক বোধে। কিন্তু বনফুলের কাছে এসে তিনি আরো কাতর, ব্যর্থতার ঘা আরো দগদগে।

ষাটের দশকের তরুণ রফিক আজাদ যে বিনষ্টির মধ্যে জীবনকে অবলোকন করেছেন, ষাটোত্তর পর্বে তা ক্রমশ ইতিবাচক জীবনচেতনায় উত্তীর্ণ হয়। তাঁর এই মানস-রূপান্তরের সমান্তরালে নিসর্গ-প্রকৃতি সম্পর্কিত বোধও ক্রমশ রূপান্তরিত হয়েছে। ষাটের দশকের কবিতায় ভয়াল রাত্রি, কাঁপনধরা শীত, বদ্ধ ডোবার জল প্রভৃতি নৈসর্গিক অনুষঙ্গ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কবি অসুস্থ সময়ের প্রতিচিত্র উপস্থাপন করেন। স্বাধীনতা-উত্তর নতুন বাংলাদেশে কবি স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে চুনিয়ার মতো প্রশান্তিদায়ক প্রাকৃতিক পটভূমি নির্মাণে। আশির দশকে সামরিক শাসন-কবলিত বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে কবির নিসর্গ-অনুভব এলিয়টীয় পোড়োজমির রূপ নিয়েছে। তবে ষাটের দশকের বিনষ্টির সঙ্গে এ পর্বের পার্থক্য হলো কবির আশাবাদ নারী ও নিসর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। নব্বইয়ের দশকে পৃথিবীব্যাপি সংঘটিত পরিবেশবাদী আন্দোলন রফিক আজাদকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে, যার প্রভাব তাঁর এ পর্বের কবিতায় লক্ষ করা যায়। *বিরিশিরি পর্ব* কাব্যে কবির নৈসর্গিক অনুভব সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে প্রবাহিত। প্রকৃতির কোলে বসে তিনি প্রকৃতির যে রক্ষক রূপ পর্যবেক্ষণ করেছেন, তা তাঁকে নগরাভিমুখী করে তুলে।

রফিক আজাদের কাব্যে নিসর্গ-প্রকৃতির যে বহুস্তর প্রকাশ ঘটেছে একক কোনো দৃষ্টিকোণে তার সর্বাংশ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আলোচ্য প্রবন্ধে কালের প্রেক্ষাপটে ফেলে রফিক আজাদের কবিমানসের যে বিচিত্র অনুভব নিসর্গ-প্রকৃতির আশ্রয়ে তা কতটুকু কাব্যিক নান্দনিকতা পরিগ্রহ করেছে, তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তারই অনুষঙ্গে প্রকৃতির প্রতি কবির দায়বদ্ধতার স্বরূপটিও উন্মোচন করা হয়েছে। আরও বিচিত্র দৃষ্টিকোণে রফিক আজাদের কাব্যে বিধৃত নিসর্গ-প্রকৃতির স্বরূপ ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

আদিত্য নিগম (২০২৪)। ‘তত্ত্ব করা’-র মানে সবার আগে নিজেদের ইতিহাসকে তত্ত্বের দিক থেকে বোঝা’ চিন্তার অর্কেস্ট্রা, সারোয়ার তুষার সম্পাদিত, গ্রন্থিক প্রকাশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা

দীপেশ চক্রবর্তী (২০২১)। *জলবায়ু পরিবর্তন ও বর্তমান অতিমারি : মানুষের ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণ*, লৌকিক প্রকাশন, ঢাকা

দেবেশ রায় (২০১০)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : নিরন্তর মানুষ*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা

নন্দদুলাল বণিক (১৯৯৯)। *রবীন্দ্রকাব্যে নিসর্গপ্রকৃতি*, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা

নোয়াম চমস্কি (২০২৩)। ‘জলবায়ু অন্যায়তা ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গে নোয়াম চমস্কি’, *রাষ্ট্রচিন্তা*, হাবিবুর রহমান সম্পাদিত, দ্বাদশ সংখ্যা, অক্টোবর, ঢাকা

বেগম আকতার কামাল (২০২০)। *শতাব্দীসন্ধির কবিতা : দিশা ও বিদিশা*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

মোহাম্মদ আজম (২০২৩)। ‘সৃষ্টিশীলতার সমাজতত্ত্ব’, রাষ্ট্রচিন্তা, হাবিবুর রহমান সম্পাদিত, দ্বাদশ সংখ্যা, অক্টোবর, ঢাকা

মোহিত রায় (সম্পাদক) (২০১৫)। *পরিবেশ চর্চা : ইতিহাস ও বিবর্তন*, অনুষ্টিপ, কলকাতা

রফিক আজাদ (২০১৬)। *কবিতাসমগ্র*, অনন্যা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা

রফিক আজাদ (২০১৯)। ‘ঢাকঢোল পিটিয়ে কবিতা হয় না। কবির সমাজের মূল্যবোধকে পাহারা দেয়, বায়ান্ন আমাদের ভাষার পাহারাদার’ মুখোমুখি রফিক আজাদ, দিলারা হাফিজ এবং পিয়াস মজিদ সম্পাদিত, চিত্রা প্রকাশনী, ঢাকা

রফিকউল্লাহ খান (২০০২)। *বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা

শহীদ কাদরী (২০১০)। *শহীদ কাদরীর কবিতা*, সাহিত্য প্রকাশ, চতুর্থ মুদ্রণ জানুয়ারি, ঢাকা

শান্তনু সরকার (২০২৪)। ‘ইকোক্রিটিসিজম: জল, জঙ্গল, মাটি ও জীববৈচিত্র্যের স্বপক্ষে এক মরমী নৈতিক প্রেক্ষণ বিন্দু’, বাংলা কবিতা ও পরিবেশ ভাবনা, রিনি গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, ইতিকথা পাবলিকেশন, কলকাতা

সৈয়দ আলী আহসান (১৯৯১)। *কবিতার কথা ও অন্যান্য বিচার*, মুক্তধারা, ঢাকা

হুমায়ুন কবির (২০১৮)। *বাঙলার কাব্য*, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, তৃতীয় সংস্করণ চতুর্থ মুদ্রণ, ঢাকা

Glottfelty Cheryl & Harold Fromm (1996) *The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology*, London and Athens: University of Georgia Press, Georgia